এখন ডুয়ার্স

জুলাই ২০১৪। মূল্য ১২ টাকা

রঙের ছটায় আলিপুরদুয়ার

এখন ডুয়ার্স

ছবি ডাঃ প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

সম্পাদনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা
নিখিলেশ রায়চৌধুরী
অমিত কুমার দে

কলকাতা দপ্তর
এই অবকাশে, ১৮/৭ ডোভার লেন,
কলকাতা ৭০০ ০২৯

মুদ্রণ
অ্যালবাট্রস

ইমেল ekhonduars@yahoo.com

প্রচ্ছদ - পশ্চিমবঙ্গের কনিষ্ঠতম জেলা আলিপুরদুয়ারের জয়ন্তীতে ছবিটি তুলেছেন ডাঃ প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

ডুয়ার্সের মানুষের সুখ-দুঃখ- ভালোবাসার খবর ডুয়ার্সের সীমানার বাইরের পৃথিবীতে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই শুরু হল 'এখন ডুয়ার্স'। প্রত্যেক মাসের প্রথমেই প্রকাশিত হবে। খবরের কাগজ বিক্রেতারা যদি নিয়মিত 'এখন ডুয়ার্স' আপনাকে পৌঁছে দিতে না পারেন তবে গ্রাহক হবার জন্য যোগাযোগ করুন। ডুয়ার্স নিয়ে আপনার চিন্তা, ভাবনা, মতামত, আবেগ সবকিছু ভাগ করে নিতে পারেন আমাদের সঙ্গে। আপনার লেখা ও পাঠানো ছবিতে 'এখন ডুয়ার্সে'র কলেবর অচিরেই বৃদ্ধি পাবে বলাই বাহুল্য।

কুমারগ্রাম ৪
গরুমারা বনবাংলো ৮
আকাশিয়ায় তিনটি দিন ১১
ছোট নতুন বাগানই ভবিষ্যৎ ১৪
চেচাখাতা ২০
বিপন্ন ডুয়ার্সের গণ্ডার ২২
যে ডুয়ার্স আমার চেনা ২৭
বন টিয়েটির মন ৩১

অভিবাদন

স্টেশন রোডের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সুবীর সাহা বা হসপিটাল পাড়ার বাসিন্দা মৈনাক বসু কিংবা লোহাপুলের দোকানি কার্তিক ঘোষ — এঁরা তিনজনই যেমন সদ্য পঞ্চাশে পা দিয়েছেন তেমনই তিনজনের বক্তব্যই এক, জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই তাঁরা শুনে আসছেন আলিপুরদুয়ারকে আলাদা জেলা করা 'উচিত' এবং এ নিয়ে সরকারি পর্যায়ে ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। তর্কের খাতিরে যদি পঞ্চাশ বছরকেই এই ন্যায্য গণদাবীর সময়সীমা ধরে নিই, তবে ২৫ জুন ২০১৪ রাজ্যের নতুন সরকার সেই দাবীকে প্রকৃত মর্যাদা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিংশতিতম জেলা হিসেবে আলিপুরদুয়ারের নাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে। ডুয়ার্সের শান্তিপ্রিয় মানুষের নিরীহ সত্তা তৃপ্ত হল, তাই আপামর জনসাধারণ পথে নেমে দলমত নির্বিশেষে হৃদয়ের অভিনন্দন জানাল পরস্পরকে। একই সঙ্গে অসংখ্য আশার বীজ বপন হল লক্ষ ডুয়ার্সবাসীর হৃদয়ে — এইবার যদি কিছু হয়।

অন্তহীন বনজ সম্পদ আর হতদরিদ্র আদি জনজাতির মানুষদের নিয়ে 'নিবিড় আলোর অন্তঃপুরে' কাটাচ্ছিল জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্যন্ত মহকুমা আলিপুরদুয়ার। ইংরেজদের চা বাগানের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের মানুষের আমদানি হল, তারা মূলত কুলিকামিন শ্রেণির। পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুরা দখল নিল অনেকাংশের। পাল্টাতে থাকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক চেহারা। চা বাগানের শ্রমিক ও বাবুদের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠল এখানকার বাণিজ্য। তবে পিছিয়ে পড়া আদি জনজাতির উন্নয়নের জন্য কোনও কাজই শুরু হল না। তারা রইল সেই তিমিরেই। চা শিল্পের মন্দার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে পড়ল স্থানীয় বাণিজ্য ও অর্থনীতি। তিরানব্বই সালের বন্যা যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল মানুষের যাবতীয় সুখ আহ্লাদ, পুরু পলিতে ঢেকে গেল এগনোর স্বপ্ন। একটা সময় মৃতপ্রায় শহর বলে মনে হত আলিপুরদুয়ারকে। পরিস্থিতির উন্নতি ঘটল, বন্ধ চা বাগানগুলি এক এক করে চালু হতে শুরু করল, আগের অবস্থায় না ফিরলেও। কিন্তু সরকারি নিস্পৃহতা, প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা, রাজনৈতিক ভাঁওতাবাজি পশ্চিমবঙ্গের এই প্রত্যন্ত মহকুমায় কোনও সুদিনের প্রত্যাশা বয়ে আনতে পারেনি। সাধারণ মানুষ একরকম ত্যাগই করে দিয়েছিল সব আশা আকাঙ্ক্ষা।

এলাকার রাজনীতি সচেতন মানুষ একটি ধারণা এখনও মনে মনে দৃঢ় ভাবে পোষণ করেন। বাম আমলে ডুয়ার্সে শরিক দলগুলির আধিপত্য বেশি থাকার ফলেই এখানে উন্নয়নের কাজে আগাগোড়াই উন্নাসিক ছিল মূল শাসকদল। না হলে আলিপুরদুয়ারকে জেলা করার দাবীতে সেই কবে থেকে সোচ্চার ছিল আর এস পি দল, কিন্তু ক্ষমতাবান বড় শরিক তাদের বুড়ো আঙুল দেখানো ছাড়া কিছুই করেনি। লাল পতাকার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য সত্ত্বেও এই ফারাকটুকু এতদিন বুঝতে পারেনি জঙ্গল ও চা বাগানের খেটেখাওয়া দরিদ্র মানুষগুলি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বামদলগুলির অসারশূন্যতা তাদের হৃদয়ঙ্গম হয়েছে, তাই দীর্ঘদিনের ঘাঁটি থেকে তাদের রীতিমত তাড়িয়ে ছেড়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলা তারই হাতেগরম পুরস্কার বললে কি অন্যায় হবে?

নতুন জেলা হয়ে আলিপুরদুয়ারের ভোল কি রাতারাতি পাল্টে যাবে? তা হয়তো নয়। কিন্তু প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কাজকর্ম যেমন গতি পাবে, জেলা বরাদ্দে উন্নয়নের সুযোগ থাকবে, তেমনই থাকবে না কোনও বঞ্চনার আশঙ্কা বা অভিযোগ। আর উদ্বোধনী বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন — পর্যটন এবং কেবল পর্যটনই পারে আলিপুরদুয়ার জেলার বিকাশ ঘটাতে। পাহাড় জঙ্গল ঘেরা জনজাতি, বন্যপ্রাণ বৈচিত্র্যে ভরা এই হেরিটেজ ডুয়ার্স তো আদি ডুয়ার্স। ডুয়ার্সের মানুষের হৃদয় ছুঁতে পেরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিবাদন তাঁর অবশ্য প্রাপ্য।

অবহেলায় বিস্মরণে কেমন আছে আজ

কুমারগ্রাম দুয়ার

যদি প্রশ্ন করা যায় পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা থেকে সবথেকে দূরে কোন ব্লক বা থানা তবে চট করে উত্তর দেওয়া মুশকিল। উত্তর - কুমারগ্রাম দুয়ার ব্লক বা থানা। একদিকে রায়ডাক, অন্যদিকে সঙ্কোশ উত্তরের শ্রেষ্ঠ সুন্দর দুই নদের মাঝে চা বাগান, জঙ্গল, পাহাড় ঘেরা ক্ষুদ্র জনপদ। এই হোলো আমার কুমারগ্রাম দুয়ার। উত্তরে ভুটান, পূর্বে সঙ্কোশ পেরলেই আসাম।

এই গ্রামেই আমি বড় হয়েছি। তখন উত্তাল ৭০এর দশক। যোগাযোগ ব্যবস্থার উল্লেখ করলে বর্তমান প্রজন্ম এমনকি কুমারগ্রাম দুয়ারের নতুন প্রজন্ম বিশ্বাসই করতে পারবে না, বাস চলত হাতে গোনা। সকাল সাতটায়, দশটায় আর বিকেল তিনটেয় 'স্টেট' বাস যেত আলিপুরদুয়ারে। এছাড়া গোটা দুই প্রাইভেট বাস। টেলিফোন যোগাযোগ ছিল কিন্তু সেটা থানা, চা বাগান ম্যানেজার এদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দূরের কোনও আত্মীয়ের কোনও জরুরী খবর আসত টেলিগ্রামে। টেলিগ্রাম মানেই বাড়িতে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যেত। কেননা অত্যন্ত জরুরী, আর সেটা অবশ্যই দুঃসংবাদ এছাড়া কেউ টেলিগ্রাম করত না। আজকের ফেসবুক হোয়টসঅ্যাপ প্রজন্ম সেই মানসিকতাটাই বুঝতে পারবে না।

জিনিসপত্রের দাম ছিল খুবই কম আর মানুষের রোজগার ছিল আরও অবিশ্বাস্য রকমের কম। দারিদ্রকে দেখেছি চারদিকে দাঁত নখ বের করে থাকতে। হাতে গোনা দু-চারজনকে ছাড়া স্বচ্ছল পরিবার দেখেছি মনে পড়ে না। কেউ বিশ্বাস করবে কিনা জানি না আমার স্কুলে বন্ধুদের দেখেছি গামছা পরে ক্লাসে আসতে। কত বন্ধু যে না খেয়েই স্কুলে আসত তার কোনও হিসেব ছিল না। আমি তো খেয়েদেয়ে জামাকাপড় পরে স্কুলে যেতাম তাই মাঝে মাঝে অপরাধ বোধ হত।

আর কষ্ট ছিল বর্ষা আর শীতে। বর্ষার রোমান্টিসিজম বোধহয় গ্রামে হয় না। ওটি শহরের প্রাচুর্য্য আর আলসের কল্পকথা। কাঁচা ঘরের নানা জায়গায় জল পড়ত, শুকনো জায়গায় বিছানা পাতাই ছিল সমস্যা। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে হলে ভিজতে হোত। রাজবংশীরা টোকা মাথায় দিয়ে এরই মধ্যে জমিতে চাষ করতে যেত। তখন কি বৃষ্টি বেশি হোত? জানি না আবহাওয়াবিদদের পরিসংখ্যান কী বলে। কিন্তু আমার তো বৃষ্টির কথা ভাবলেই মনে পড়ে চারদিক সাদা হয়ে বৃষ্টি টানা হয়ে চলেছে তো চলেছেই, দিন নেই, রাত নেই এমনকি একটানা এক সপ্তাহ বৃষ্টি হয়েছে এমনও মনে আছে। আর এই সময় অভাব হোত সবচেয়ে বেশি। গত বছরের ধান ফুরিয়ে আসত, কার্তিক অগ্রহায়নের আগে নতুন ধান উঠবে না। এই বর্ষা আর শরৎকালই ছিল বড়ো অভাবের সময়।

এর মধ্যেই পুজো আসত। প্রতিবারই শোনা যেত এবার আর পুজোর জামা কাপড় হবে না। শেষ অবধি অবশ্য হোত। সেই জামা কাপড় নিয়ে আরেক সমস্যা ছিল যে, দর্জি শেষ মুহূর্তে দিতে পারবে কি না। রোজ গিয়ে দুবেলা খোঁজ নিয়ে আসা, চতুর্থী যায়, পঞ্চমী যায়, ষষ্ঠীতে গিয়ে পাওয়া গেল। সেই জামা কাপড়ের যা ছিরিছাঁদ যে দেখলে এই লিভাইস প্রজন্ম হেসে গড়াগড়ি যাবে।

পুজোর আরেকটি আকর্ষণ ছিল নিউল্যান্ডস চা বাগানের মেলা। বিশাল ভিড় হোত। গোটা এলাকার মানুষ এসে জুটত। আর আসত সার্কাস, বেশ বড়ো সার্কাস। কালো রাতের বুক চিরে আলোর বর্শা উঠে

ফুটবলের যে কৌলীন্য ছিল গোটা ডুয়ার্স জুড়ে তা আজ নিঃসন্দেহে নেই। এটা নিয়ে যদি কিছু করা না যায় তবে বাংলা ফুটবলে পিছিয়ে পড়ছে কেন এই নিয়ে পাঁচতারা হোটেলে সেমিনার করে কোনও লাভ নেই

যেত আকাশে। আকাশ জুড়ে সেই বর্শার দাপাদাপি দেখতে দেখতে আমরা বায়না জুড়তাম বাবা মায়ের কাছে। বহু পরিশ্রমের পর একদিন যাবার অনুমতি এবং কিছু পয়সা দুটোই জুটত। ছ'-সাত কিলোমিটার হেঁটে গ্রাম ভেঙে সবাই চলত মেলা অভিমুখে। ফেরবার সময় পা আর চলত না। কয়দিন বেশ কাটত।

আমাদের আর ছিল মাঠ। বিকেল হতেই দল বেঁধে সবাই জুটত মাঠে। গরম বর্ষায় ফুটবল, শীতে ক্রিকেট, ভলিবল। ছোটরা গোল্লাছুট, পাতা আনা আর দাড়িয়াবান্ধা। ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে। এটা কেউ বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আমরা ক্রিকেট খেলেছি ডিউস বলে, এখনকার মতো টেনিস বলে নয়। শীতে চা বাগান অঞ্চলের ক্রিকেট খেলাটায় একটা কলোনিয়াল আবেশ ছিল। আমি খুব উপভোগ করতাম। তবে ফুটবল ছিল রাজা। ফুটবলাররা ছিল হিরো। বুধেনদা, নুপুরদা, নিমাইদা, গৌর, জগদীশ কেরকেট্টা এরা ছিল গ্রামের হিরো। এর মধ্যে বুধেনদা (নার্জিনারী) আর নুপুরদা (সুর) কলকাতার

রায়ডাক

প্রথম ডিভিশনে দীর্ঘদিন খেলেছিল। যেদিন ম্যাচ থাকত মাঠের চারদিকে ভিড়। আর যেদিন বড়ো ম্যাচ থাকত বিশেষ করে কোনও টুর্নামেন্টের খেলায় যদি কোকরাঝাড়ের দল বা কামাক্ষ্যাগুড়ির দলের সঙ্গে খেলা থাকত সে দিন তো মেলা বসে যেত। আজ এই টেলিভিশন, মোবাইলের যুগে খেলার মাঠের আবেগ সম্পূর্ণ অদৃশ্য। আমার মনে পড়ে গ্রামের দলের খেলা দেখতে সাইকেল করে দল বেঁধে ২০ কিলোমিটার দূরে বারোবিশা, ৩০ কিলোমিটার দূরের কামাক্ষ্যাগুড়ি চলে যেতাম। সে বড়ো সুখের সময়।

এখন গ্রামে খেলাধুলোর বৈচিত্র্য অনেক কমে গেছে। গোল্লাছুট দাড়িয়াবান্ধা আর কেউ খেলেনা। সারা বছর কিছু ছেলে এখন ক্রিকেট খেলে চলেছে; টেনিস বলে। ফুটবল প্রায় হয়ইনা। আগে গ্রামে যে অজস্র টুর্নামেন্ট হোত, তা আজ অদৃশ্য। কিছু ছেলে বল পেটাপেটি করে বটে কিন্তু ফুটবলের যে কৌলীন্য ছিল গোটা ডুয়ার্স জুড়ে তা আজ নিঃসন্দেহে নেই। এটা নিয়ে যদি কিছু করা না যায় তবে বাংলা ফুটবলে পিছিয়ে পড়ছে কেন এই নিয়ে পাঁচতারা হোটেলে সেমিনার করে কোনও লাভ নেই।

একটু বড়ো হতে দেখেছি গ্রামে বর্গা অপারেশন আর পঞ্চায়েত। এরপর ধীরে অবস্থা পাল্টাতে লাগল। দারিদ্র্য ছিল কিন্তু তার মাত্রাটা কিছু কমল। গ্রামে বিদ্যুৎ এল। আর ৭০এর দশকে বাংলাদেশ থেকে আসা দরিদ্রতম পরিবারগুলি, যারা ঠাঁই পেয়েছিল সঙ্কোশ আর রায়ডাকের চরে তারা ছিল সবচেয়ে দরিদ্র। এরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ধীরে ধীরে গোটা এলাকায় কৃষিতে বিপ্লব করে দিল।

কৃষি প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে মনে পড়ে গেল; গ্রামে ছিল বহু প্রাচীন এক সেচ ব্যবস্থা। আমরা সেই ক্যানেলগুলিকে বলতাম জাম্রাই। 'টারে' বলে এক ধরনের পেশা ছিল। যারা খরার সময় জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করত। বাঁশ দিয়ে নদীতে বাঁধ দেওয়া হত আড়াআড়ি। ফসল উঠলে 'টারে' একটি অংশ পেত। গ্রামীণ এই ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা সত্যিই ছিল কার্যকরী। পরবর্তীকালে এই গ্রামের এক কৃতী সন্তান সেচ দপ্তরের বাস্তুকার হিসেবে দায়িত্ব নেয়। তার একান্ত চেষ্টায় এই অঞ্চলের যে ছোট ছোট নদী আছে তার একটি 'ঘোলানী' নদীতে একটি ছোট কিন্তু কার্য্যকর ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। সেই ব্যবস্থা আজ গ্রামের কৃষিতে খুবই সহায়ক হয়েছে। একইরকমের সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় কুলকুলি নদীতে। বড় বাঁধ নয় এই ছোট অথচ কার্য্যকর সেচ ব্যবস্থাই গ্রামগুলির অবস্থা পাল্টে দিতে পারে। ঘোলানী নদীর প্রকল্প তার প্রমাণ।

আর রাজবংশী সমাজ আকঁড়ে ধরেছিল পড়াশোনা। হেমাগুড়ি অঞ্চলের মেচ সম্প্রদায়। এখন এই অঞ্চলে ঘরে ঘরে সরকারি চাকুরে। প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক থেকে শুরু করে আই এ এস অবধি।

গ্রামে ইলেক্ট্রিসিটি ঢুকল ৯০এর দশকে। তখন আমি গ্রাম ছেড়ে শহরের বাসিন্দা। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে টিভি ঢুকে যায় ১৯৮৬ তে। সালটা নির্ভুল মনে আছে কেন না সেই বছরই আমাদের ৩৩ কোটি দেবতার সঙ্গে আরেকজন যোগ দিলেন। দিয়েগো আর্মান্দ মারাদোনা। ১৯৮৬-র বিশ্বকাপ সেই ব্যাটারিতে চলা সাদাকালো টিভিতে দেখে

ডুয়ার্সের সমস্ত অঞ্চলে চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন ছিল। কুমারগ্রাম অঞ্চলে চা বাগানের শ্রমিক আন্দোলনে আর এস পি'র প্রাধান্যই ছিল নিরঙ্কুশ। অন্যান্য বামপন্থী দল আর কংগ্রেসেরও কিছু সংগঠন ছিল। সবটাই ছিল চা বাগানে লড়াই সংগ্রাম কেন্দ্রিক। কবে সেটা বদলে গিয়ে চা বাগানগুলো 'ভোট ব্যাংক' হয়ে উঠল আর বাগিচা শ্রমিকদের লড়াই গেল পিছিয়ে। তাই বোধহয় শ্রমিকরা আজ সম্প্রদায় ভিত্তিক সমাজে বিভক্ত

কী চমকই না লেগেছিল। আর মারাদোনা, ওহ্ অবিশ্বাস্য। আজও ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।

আজও নষ্টালজিয়া জাগায় গ্রামে সেই অ্যান্টেনার সারি। কারো কারো বাড়িতে আবার দুটো। একটা কার্শিয়াংয়ের দিকে তাক করা আরেকটি বাংলাদেশের দিকে।

কিন্তু কে জানত সেই টিভি, পঞ্চায়েত

গ্রামের অবস্থাটা আমূল পাল্টে দেবে আজ। কুমারগ্রামে পঞ্চায়েতের ঠিকাদারি, অর্থনৈতিক নতুন শ্রেণির জন্ম দিয়েছে। তারাই এখন গ্রামের নিয়ন্তা। সব জায়গায়ই কি তাই, এটা নিয়ে গবেষকরা কী বলছেন? ছোটবেলায় যে গ্রামকেই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর বলে মনে হত, বড় হয়ে যতদিন গ্রামে ছিলাম ততদিন তার অসুবিধেগুলোই বেশি চোখে পড়ত। আজ যখন গ্রাম ছেড়ে অনেকটা দূরে চলে এসেছি, সময়ের হিসেবে তখন বুঝতে পারি কী অসম্ভব সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল, আর কী অসম্ভব সুন্দর সময় ছিল। অন্য কার কী ছিল জানি না, কিন্তু আমাদের মাতৃভাষাই ছিল রাজবংশী। ওরাই তো ছিল পড়শি বন্ধু। চা বাগানের আদিবাসীরা, রাজবংশীরা, মেচ রাভা সম্প্রদায়, নেপালি সম্প্রদায়, বিহার থেকে আসা একটি ছোট্ট সমাজ আর পূর্ববঙ্গ থেকে বিভিন্ন সময়ে আসা উদ্বাস্তুদের তো মিলেমিশেই থাকতে দেখেছি। তবে কোনও সমস্য তো নিশ্চয়ই ছিল। ডুয়ার্সের সমস্ত অঞ্চলে চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন ছিল। কুমারগ্রাম অঞ্চলে চা বাগানের শ্রমিক আন্দোলনে আর এস পি'র প্রাধান্যই ছিল নিরঙ্কুশ। অন্যান্য বামপন্থী দল আর কংগ্রেসেরও কিছু সংগঠন ছিল। সবটাই ছিল চা বাগানে লড়াই সংগ্রাম কেন্দ্রিক। কবে সেটা বদলে গিয়ে চা বাগানগুলো 'ভোট ব্যাংক' হয়ে উঠল আর বাগিচা শ্রমিকদের লড়াই গেল পিছিয়ে। তাই বোধহয় শ্রমিকরা আজ সম্প্রদায় ভিত্তিক সমাজে বিভক্ত।

ঐতিহাসিক ভাবে দেখলেও কুমারগ্রামে স্বাধীনতার আগে থেকেই সমাজের চরিত্র এমনই মিশ্র ছিল। স্বাধীনতার ইতিহাসে বাংলার ভূমিকা লিখতে গিয়ে কলকাতা ও তার আশপাশ এবং ঢাকা আর তার চারপাশের ইতিহাসই গুরুত্ব পেয়েছে। কত জন জানেন কুমারগ্রাম দুয়ারের স্বাধীনতার ইতিহাসে উজ্জ্বল ভূমিকার কথা। অসহযোগ আন্দোলনের সময় কুমারগ্রামের থানায় বিখ্যাত দেশপ্রেমিক সতীন সেনকে অন্তরীণ করা হয়। রায়ডাক পেরিয়ে ওপারেই ছিল বক্সা ফোর্ট। বহু রাজবন্দীকে সেখানে রাখা হোত। দুর্গমতার কারণে বক্সা ফোর্টকে দ্বিতীয় সেলুলার জেল বলা হোত। সেই সময় সরকারি হাট বয়কটের ডাক ছিল। কুমারগ্রামের সরকারি হাট বয়কট করে কুলকুলির হাট স্থাপন হয় ১৯২১ সালে। সেই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মঘা দেওয়ানী, পশুপতি কোঙর। মঘা দেওয়ানীকে গ্রেপ্তার করলেও জনতার চাপে তাঁকে নিঃশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হন বিচারক। সেই সময় দুই পাঞ্জাবী যুবক, চন্দ্রদীপ সিং আর কুলদীপ সিং অনন্য সাধারণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে ৪২এর আন্দোলনে তমলুক, বালুরঘাটের মতো কুমারগ্রাম থানা দখল করে স্বাধীন ভারতের পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন দেবেন দাস, পোয়তু দাস, অবিনাশ দাস, সুনীল সরকার, দেওয়ান রায় প্রমুখ। থানা দীর্ঘদিন দখলে রাখতে ব্যর্থ হলেও সেই আন্দোলনের ইতিহাস অত্যন্ত উজ্জ্বল। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে তমলুকের কথা সবাই জানেন, জানেন মাতঙ্গিনী হাজরার কথা। কিন্তু ক'জন জানেন পোয়াতু দাসের কথা? তিনিও দারোগার উদ্যত বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁর ক্ষেত্রে দারোগা ভয়ে বন্দুক নামিয়ে নিয়েছিলেন।

এই কুমারগ্রাম নামে দুয়ার যুক্ত হয়েছে ভুটানের কালি খোলায় যাবার দুয়ার হিসেবে। কুমারগ্রাম নাম হয়েছে কোঙর পরিবারের নামে। কোঙররা ছিলেন এই গ্রামের জমিদার এবং ভুটান রাজার নিযুক্ত কাঠাম বা বিচারক। কোঙরদের গ্রাম থেকে কুমারগ্রাম সেখান থেকে কুমারগ্রাম দুয়ার।

এই অঞ্চলের চা বাগানগুলির পত্তন হয়েছে মোটামুটি ১৮৯০ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে। একসময় নিউল্যান্ডস চা বাগানে ছিল এয়ারস্ট্রিপ। এখনও তা রয়েছে পরিত্যক্ত

কুমারগ্রামের স্কুল ১৯৩৪ সালে স্থাপিত। নাম ছিল মদন সিং উচ্চবিদ্যালয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত প্রান্তের পাহাড়, নদী, জঙ্গল ঘেরা এই ক্ষুদ্র জনপদের স্কুলটি সত্যই স্বর্ণপ্রসবা। এই গ্রাম থেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের গবেষক, আই আই টির বেশ কিছু কৃতি ছাত্র, আমলা, সম্প্রতি আই পি এস সবই হয়েছে

অবস্থায়। ছিল গলফের মাঠ। সে মাঠে কত ক্রিকেট খেলেছি। কুমারগ্রামের স্কুল ১৯৩৪ সালে স্থাপিত। নাম ছিল মদন সিং উচ্চবিদ্যালয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত প্রান্তের পাহাড়, নদী, জঙ্গল ঘেরা এই ক্ষুদ্র জনপদের স্কুলটি সত্যই স্বর্ণপ্রসবা। এই গ্রাম থেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের গবেষক, আই আই টির বেশ কিছু কৃতি ছাত্র, আমলা, সম্প্রতি আই পি এস সবই হয়েছে। আজও এই গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় সকাল সন্ধ্যায় ছাত্রদের পড়ার আওয়াজ ভেসে আসে। বোঝা যায় স্কুল দুটি, এম এস কে, এম এসকে গুলি কাজ করে চলেছে। তফাৎ একটা হয়েছে। সে যুগে শিক্ষক, শিক্ষিকারা বাইরে থেকে আসতেন আর এই গ্রামে বাস করতে করতে এই গ্রামের বাসিন্দা হয়ে যেতেন, জড়িয়ে পড়তেন গ্রামের ভালোমন্দের সঙ্গে। এখন যোগাযোগের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে, আজ আর সাতটা, দশটা বা তিনটের বাসের অপেক্ষা করতে হয় না। শিক্ষক শিক্ষিকারা নিত্য যাওয়া আসা করতে পারেন, করেনও। তারপর এই গ্রামের যতই উন্নতি হোক, মল নেই, সিটি সেন্টার নেই, কাফে কফিও নেই, মাল্টিপ্লেক্স নেই। ফলে গ্রামে থাকাটা আর হয় না। অমর্ত্য সেনের প্রতীচী ট্রাস্টের একটা গবেষণার কথা পড়েছিলাম। গ্রামে শিক্ষকদের উচ্চ বেতন তাদেরকে গ্রামের উচ্চতম শ্রেণিভুক্ত করে ফেলেছে, তাই রামা কৈবর্ত, রহিম শেখের ছেলেদের পড়াতে তারা আর আগ্রহ বোধ করেন না। সেটা বোধহয় সত্য।

আজ যখন গোটা ডুয়ার্স জুড়ে দেখি পর্যটনের একটি উত্থান। যখন দেখি আমার পাহাড়, জঙ্গল, নদী, সবুজ চা বাগান ভরা ডুয়ার্স রসিকদের মন জয় করতে শুরু করেছে, তখন আফশোষ হয়। সঙ্কোশের মতো সারা বছর টলটলে জলে ভরা নদী, আর আছে রায়ডাকের নাম সার্থক করে বর্ষার রাতে দূর থেকে শোনা গর্জন। বালাপাড়ার জঙ্গল, টিয়ামারার জঙ্গল সবই অসাধারণ সুন্দর। ১৯৬৮ তে হাইওয়ে হবার আগে যোগাযোগ ছিল জয়ন্তী, নিউ ল্যান্ডস হয়ে। সেই রাস্তাটি যদি আবার সুন্দর করে গড়ে তোলা যেত সেটা হোত সেরা টুরিস্ট ড্রাইভ। কোথায় লাগে লাটাগুড়ি আর জলদাপাড়া। সঙ্কোশে বা রায়ডাকে হতেই পারে র‍্যাফটিং। এছাড়া কুমারগ্রামের অবস্থানই এমন যে পর্যটনের জন্য একদম তৈরি। দুই দিকে সৌন্দর্য্যময় সারা বছর জলে ভরা দুই নদ। রায়ডাকের পশ্চিম আর সঙ্কোশের পূবে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ঘন জঙ্গল। উত্তরে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় হিমালয়, চা বাগান তো রয়েছেই। মনে পড়ে যায় এখানে একটি অনবদ্য ডাক বাংলো ছিল। তার দোতলা কাঠের কাঠামো, ঘরে ইউরোপীয় সুবিধে, বড় বড় আর্মচেয়ার। সেটিকে ভেঙে ফেলে কুৎসিৎ এক ঘর বানানো হল। এই যদি হয় চিন্তা ভাবনা, তবে পর্যটন হওয়া মুশকিল। কোনও দিশারী চাই। বক্সার এই অঞ্চলে সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে অবহেলায় অনাদরে ক্ষমতাশালী দূরদর্শী কারো আবিষ্কারের অপেক্ষায়। সরকার ছাড়া এই উন্নয়ন সম্ভব নয়। কবে দেখা যাবে সেই উদ্যোগ যা লাটাগুড়ির মতো ছোট্ট জনপদের অর্থনৈতিক চেহারা পাল্টে দিয়েছে?

পত্রপত্রিকায় কুমারগ্রাম দুয়ারের খবর উঠে আসে সবসময়ই কোনও লজ্জার ইতিহাসের দূত হয়ে। বজ্রপাতে ৮টি হাতির মৃত্যু, উগ্রপন্থী আন্দোলন অথবা এই অঞ্চলের জন প্রতিনিধিদের দলবদলের দীর্ঘ ইতিহাস — এই সবই উঠে আসে খবরের শিরোনামে। কবে এর পরিবর্তন হবে আর উজ্জ্বল কোনও কারণে এই অঞ্চল খবরের শিরোনামে উঠে আসবে?

তাপস বরণ চন্দ

গরুমারা বনবাংলো

শতবর্ষের আলোয়

প্রারম্ভে বলা ভালো বনবাংলো নিয়ে ধারাবাহিক ইতিহাস তথ্যসমৃদ্ধ সাতকাহন লিখতে বসি নাই। হাতি, গন্ডার, বাইসন, কীটপতঙ্গ, গাছপালার বিবরণ অনেকেরই অল্প বিস্তর জানা। আমার ভালোলাগা বনবাংলোর সামগ্রিক পরিবেশ, নিরিবিলি নির্জনতা, অসাধারণ অ্যাম্বিয়েন্স। আমার চোখের চেয়ে দেখা, হৃদয় দিয়ে অনুভব। কম করে বছর ৪৫ আগের প্রথম দেখার আনন্দঘন স্মৃতি। এখন মেলানো কঠিন। তা নিয়ে দুঃখ আফশোষ করার কিছু নেই। আজ ডুয়ার্স প্রেমীদের কাছে গরুমারায় রাত্রি যাপন ভীষণ ক্রেজ। যেমন জলদাপাড়ায় হলং লজ। মুশকিল হোল সে সময় চাইলেই বনবাংলোতে থাকার অনুমতি দিতেন না ডি এফ ও সাহেব। জঙ্গলের ভিতরে দুকামরার ঘর, চমৎকার সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর, নিঃসন্দেহে লোভনীয়। একবার চেষ্টা করে যদি বা থাকার অনুমতিপত্র জুটল শেষপর্যন্ত কোনো এক হোমরাচোমরার আগমনে বাড়াভাতে ছাই। মনের দুঃখে লাটাগুড়িতে পরাণের বাড়িতে থেকে যাই। আমি ছাপোষা মানুষ, মাস্টারমশাই, বনজঙ্গলের কোন ছাতা বুঝি? গাড়িতে বনবাংলো দর্শন করে ফেরা। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো। আবার অফুরন্ত ভালোবাসা আদর যত্ন পেয়েছি তা ভোলার নয়।

কৈশোর যৌবনে বনবাংলোর রোমাঞ্চ অভিজ্ঞতা বলতে, হাতেখড়ি বলতে পারেন মহানন্দা অভয়ারণের পথে সেবক পাহাড়ের দিকে যেতে দশ মাইলে ঘন শালবনের ভিতরে তিস্তার কোল ঘেঁষে সেবক ফরেস্ট রেস্ট হাউস। ছোট্ট অপরূপ ব্রিটিশ জমানার কাচে ঘেরা লাউঞ্জ থাকাখাওয়ার সুন্দর বন্দোবস্ত। প্রায়শ চলে যেতাম। কত বর্ষা মুখর রাত, কুয়াশামাখা প্রভাত, মোলায়েম রোদ্দুরে আলোতে-ছায়াতে বনবাংলোতে কেটেছে। ভালো লাগত সাদা জ্যোৎস্না। বনভূমি জুড়ে বিচিত্র শব্দ ঝঙ্কার। একবার ঘোর বর্ষায় দুপুর বেলায় ছাতা মাথায় শালবনে বেড়াই। শাল অরণ্যে বৃষ্টির শব্দ ভোলার নয়। বাংলোর অদূরে বসার জায়গা। অদূরে তিস্তা মংপং। প্রচুর হরিণ দেখা যেত। অতীতে নাম ছিল বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলমহল। আমরা পায়ে পায়ে চমকডাঙী, লালাটঙ, চকলং, ঘোড়ামারা, জঙ্গলের কোথায় না গেছি। শিলিগুড়ির বাড়ি থেকে হেঁটে দাগাইব, মোহরগাড-গুলমা হয়ে শুকনা রেঞ্জ, শুকনা বনবাংলো। অসাধারণ। রাত্রিতে থাকার প্রয়োজন পড়েনি। দিনভর

কাটিয়ে ঘরে ফেরা। বনবাংলো থেকে হাঁটতে হাঁটতে শুকনা লেক। এখন লেক কোথায়? খটখটে শুকনো। বনভূমি পাতলা হয়ে আসছে। বড় দুঃখের।

তরাই ডুয়ার্সের পুরাতন কাঠের বনবাংলোগুলির গঠন প্রকৃতি, প্যাটার্ন সর্বত্র যেন প্রায় একই রকম। নকশালবাড়ির অদূরে টুকরিয়া ঝাড় বনবাংলো, ব্যাঙডুবি, সর্বত্র চষে বেড়ানো। বেলগাছি থেকে হাঁটতে হাঁটতে লোহাগড় জঙ্গল হয়ে খয়েরবনী। সব বাংলোই বেশি পুরনো নয়। এর মধ্যে ব্যাঙডুবি ভি আই পি-দের জন্য।

এবারে গরুমারা বনবাংলোতে প্রথম রাত্রি যাপনের মধুময় স্মৃতি একটু আধটু শোনাই। পশ্চিম ডুয়ার্সের অনিন্দ্য সুন্দর নয়ন ভোলানো অতি নির্জন গরুমারা বনবাংলোর লোকেশন। ৪৫ বছর আগে এত ভিড় হট্টগোল উৎপাত কিছুই ছিল না। ইকোটুরিজম নামক হলুদের গুঁড়ার অস্তিত্ব ছিল না। ছিল না ডে-ভিজিটরদের সকাল বিকাল অত্যাচার কলরব, কোলাহল। সিগারেটের ধোঁয়া, কারণসুধা, চিপসের প্যাকেটে পরিবেশ লাটে উঠেছে। কালেভদ্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি, বনদপ্তরের কেউকেটা যেমন ডি এফ ও, সি এফ, জেলাশাসক, পুলিশের উর্ধ্বতন কেউ বনবাংলোতে রাত্রি যাপন করতেন। আমার জানা নেই শতবর্ষের ভিজিটরস নোটবুক সিরিয়ালি সাজানো আছে কি না। যদি থাকে তো জলপাইগুড়ি অরণ্য ভবনে গিয়ে কিম্বা অনুমতি সাপেক্ষে নোটবুকের পাতা উল্টে দেখতে ইচ্ছে করছে। গরুমারা বনবাংলোতে খোঁজ করে সুদূর অতীতের মন্তব্য খাতা পাই নাই। চৌকিদার, বীটবাবু এসবের গুরুত্ব বোঝে না। কিম্বা বুঝতে চান না। একবার ভাবুন তো, ১৯১০ সালে কোনো সাহেব বন পথে যেতে যেতে গণ্ডার, হাতির মুখোমুখি হয়ে তাঁর আত্মরক্ষার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন! গরুমারা বনবাংলোর শতবর্ষ অতিক্রান্ত হলেও তেমন মনোমতো অনুষ্ঠান আলোচনা চক্র হল না। এমন কি বনবাংলোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে কেউ লিখেছে বলে মনে হয়? অথচ ঊর্ধ্বতন বনকর্তা সম্পৎ সিং বিস্ত মশাই চমৎকার পুস্তিকা রচনা করেন ১৯০৮ সালের রায়ডাক বনবাংলোর উপর। ভিজিটরস নোটবুক থেকে বহু তথ্য তথা বাংলো তৈরির খরচ ইত্যাদি মজার মজার খবর আছে সেখানে। গরুমারা বনবাংলো ঘিরেও এরকম স্মৃতিরোমন্থন কি সম্ভব নয়? বর্তমান বনাধিকারিক বিষয়টা নিয়ে ভাবুন।

গরুমারা বনবাংলোতে রাত্রি যাপনের জন্য ৪৫ বছর আগে যখন শিলিগুড়ি থেকে আবেদন পত্র পাঠাই সঙ্গে সঙ্গে নাকচ হয়ে যায়। অতঃপার সটান হাজির হই তিস্তা উদ্যানের পাশে ডি এফ ও অফিসে। আজকের কালেকটরেট অ্যাভিন্যুতে। কদমতলায় নেমে ঠিকানায় পৌঁছে যাই। জলপাইগুড়ির বনেদী খানদানী এলাকা। পুরনো দিনের লাল রঙের প্রাসাদোপম বিশাল বিশাল বাংলো। সম্মুখে পেছনে সুন্দর সবুজ লন। চোখ জুড়িয়ে যায়। ডি এম, এস পি, মহকুমা শাসক, ডি এফ ও সাহেবদের বাংলো। যাই হোক প্রথমে বড়বাবুর কাছে যাই। কান চুলকাতে চুলকাতে বলেন — "পাইবেন না। সাহেব রাজী হইব না। অন্য কোথাও যান।" তার মানে? "হবে না।" শেষ পর্যন্ত ডি এফ ও-র সঙ্গে দেখা করি। আমাদের উদ্দেশ্য বিধেয় নিবেদন করি। ফূর্তি মৌজ মস্তির জন্য নয়। আরণ্যক সৌন্দর্যের জন্য। টু এনজয় সিরিন অ্যান্ড সাবলাইম বিউটি অফ নেচার। কথা দিই বন ও বন্যপ্রাণের কোনো ক্ষতি করব না। এক/দুই রাত্রির জন্য অনুমতি দিন। নিমরাজী হয়ে শেষ পর্যন্ত বড়বাবুকে ডাকিয়ে আমাদেরকে দু'দিনের জন্য বনবাংলোতে থাকার লিখিত অনুমতিপত্র দিলেন। ব্যস আর পায় কে! কাগজ পকেটে পুরে যাযাবরে ঢুকে ডালভাত, সবজী, ভাজা দিয়ে আহার করে শিলিগুড়ি ফিরে বন্ধুদের বলি, একটা অসাধ্য সাধন করলাম। বনবাংলোতে থাকার অনুমতি পাওয়া গেছে। বাংলোর ভাড়া ২৫/৩০ টাকার বেশি নয়। খাবারদাবার সঙ্গে নিতে হবে। চৌকীদার রেঁধে বেড়ে দেবে। ডু ফূর্তি নো চিন্তা। কমল, স্বদেশ বলল, "সুকমলদাকে রাজী করান।" ওনার অ্যাম্বাসাডার আছে। নিজেই চালান। তেলের পয়সা দিলেই যথেষ্ট। উনি থাকবেন আমাদের সঙ্গে। সন্ধ্যাবেলায় জোর আলোচনা। সঙ্গে কী কী নিয়ে যাবো। উপেনদার কাছ থেকে কেনা রাশিয়ান ক্যামেরা, কোডাক ক্যামেরা নিয়ে নিই। সাদা কালোর যুগ। রীলে ফিল্ম। গণ্ডার হাতির ছবি ওঠাতে হবে তো। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বনবাংলো, গাছপালা, মানুষের ছবি তোলা হয়। এখন হাসি পায় ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফির কত রকম কায়দা কানুন। সেই সময় আমাদের এত সুযোগ ছিল না, তবে উত্তেজনার আগুন পোহানোর খামতি ছিল না।

— যাচ্ছো কোথায়? প্রতিবেশীরা জিজ্ঞেস করে। গরুমারা জানালে বলে — থাকবে কোথায়? বনবাংলোতে। কী করে? বুকিং মানে সংরক্ষণ করেছ? একগাদা প্রশ্ন।

সব কিছু রেডি। যাবার দিন টিপটিপ বৃষ্টি। গাড়ির পেছনে দুদিনের যাবতীয় রসদ। চা থেকে পাঁচফোড়ন। সুকমলদার ছাইরঙা অ্যাম্বাসাডর বেতো ঘোড়ার মতন ছুটছে। ওয়াশাবাড়ি, বাগরাকোট, ওদলাবাড়ি, মালবাজার হয়ে চালসার গোলাই। আমাদের আনন্দ দেখে কে। সেসময় চালসায় এত দোকানপসার ছিল না। এমনকি সেবকে হাতেগোনা দুচারটা দোকান। গোলাইতে ঝুপড়ি চা দোকানে ঢুকে গলাটা ভেজাই। একটু বুদ্ধির ঘটে ধোঁয়া দেওয়া। দুলুভাই বলে "চিন্তা করে দ্যাখ্ কিছু বাদ পড়ল কিনা।"

জঙ্গলের ভিতরে কিছুই পাওয়া যাবে না। বিশু ফর্দ বের করে দেখে। যা বাদ পড়েছিল কেনা হল। ব্যস এবারে চলো যাই বনবাংলো। মঙ্গলবাড়ি, মাদুরা ফরেস্ট, বাতাবাড়ি চা বাগান, আইভিল হয়ে টিলাবাড়ি, বড়দীঘি চা বাগান। বাঁদিকে গরুমারার সাইনবোর্ড। একেবারে নিঝুম। মোটর পথে শুধু ট্রাক বাসের দুরন্ত গতিতে ছোটাছুটি। গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে তাকাই। লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। এমন সময় এক ফরেস্ট গার্ড ছুটতে ছুটতে এল। ওর ধারণা সাহেবটায়েব এসেছেন ভিজিট করতে। আমাদের দেখে তার প্রশ্ন — "বাংলোতে থাকার পারমিশান নেই।" পকেট থেকে অনুমতিপত্র ওর নাকের ডগায় মেলে ধরতেই বলে — "তাই বলেন। ঠিক আছে।" লাঠা তুলে দিতেই অরণ্যপথে গাড়ি চলতে থাকে। দুপাশে ঘনবন। সিমুল, শিরীষ, শাল, সেগুন, ছাতিম, লতাপাতা তন্তুজালে সমাচ্ছন্ন বনতল যেন সবুজ মোজাইক। তীব্র ঝিঁঝিঁ পোকাদের ডাকাডাকি। আমরা কাঠপুতুলের মতন। চোখ কান সতর্ক। এই বুঝি গণ্ডার না হলে বাইসন গাড়ির সামনে এসে পড়ল। তেমন কিছুই নয়। দুই একটি ময়ূর, বনমোরগ, হরিণের সমানে ডাক ...। বনজ গন্ধ নাকে ভেসে আসছে। এঁকেবেঁকে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতন দূর থেকে চোখ পড়ল বনবাংলো। মাহুত, পোষাহাতি, বীটবাবুর কোয়ার্টার। লিচু গাছের ছায়ায় গাড়িটি দাঁড়ালে আমরা নেমে আনন্দে আত্মহারা। বীটবাবুর সঙ্গে পরিচয় হোল। উনি আমাদের সঙ্গে বাংলোর দরজার কাছে এসে চৌকীদারকে ডাক দিলেন। বাদবাকী কাজ চৌকীদারের। বাসনপত্র গাড়ির ডিকি থেকে নামিয়ে নিয়ে গেলে আমরা বাংলোর উপর নীচ করতে থাকি। কী সুন্দর লাউঞ্জ কাম ডাইনিং! কাঠের তক্তা, বাটাম, গোলাই সবই আগের মতন।

বাংলোর ভিতরে প্রবেশ করে মনে হল রাজকীয় অনুভূতি, অনিবার্য আবেশ। বিছানাপত্র, আসবাব, স্নানঘর, নেটে ঘেরা বারান্দা, চেয়ার টেবিল, এলাহী বন্দোবস্ত। নিজেদের একটু গুছিয়ে নিয়ে গোল হয়ে বসে চা টা খাই। চৌকীদার জিজ্ঞেস করে ব্রেকফাস্ট করবেন তো? বিশু বলল — "রান্নাবান্নার সময় আমি তোমার সঙ্গে থাকব বুঝলা।" বাংলো প্রদক্ষিণ ও পর্যবেক্ষণ শেষ করে পাখির ডাক শুনতে শুনতে বন্যজন্তু পরিদর্শন মঞ্চে গিয়ে বসি। অনেক নীচে মূর্তির কাছে ঘাস জমিতে লবণের স্তূপ। বন্যপ্রাণীরা লবণ চাটতে আসে। বীটবাবু বললেন — ঘণ্টা দুয়েক আগে গণ্ডার এসেছিল। বাংলো থেকে বেশি দূরে হেঁটে চলাফেরা করবেন না। রিস্‌কি ব্যাপার। কিছু হয়ে গেলে আমি ঝামেলায় পড়ব। ক্যান্টিলিভারটির নাম এখন রাইনো পয়েন্ট। বাংলোর অতিথিরা ওখানে বসে থাকার সুযোগ পান। আজকাল টুরিস্টরা যাত্রাপ্রসাদ ওয়াচটাওয়ারে বসে বন্যপ্রাণী দর্শন করেন। সকালবিকাল গাদাগুচ্ছের জীপসী বোঝাই মানুষের মাথা। চেঁচামেচি, হট্টগোল। শব্দদূষণে গরুমারার দফারফা। সরকার নিরুপায়, পর্যটন বনদপ্তর, পরিবেশ প্রেমীরা অসহায়। ওয়াইল্ড লাইফ টুরিজমের প্রসার-পশার দুটোই তো চাই। আমি যখনকার কথা বলছি তখন এসব ছিলই না। লাটাগুড়ি ছিল ঘুমন্তপুরী। ইকোটুরিজম, ভিলেজ টুরিজম, হোমস্টে, মোদোমাতালের অত্যাচার কিছুই ছিল না। একেবারে শান্ত নীরবতা।

বনবাংলোতে আমরা জমিয়ে আড্ডা, অরণ্যের মোহময়ী রূপে মজে থাকি। দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে বাংলোর লনে যতটুকু সম্ভব ঘুরে বেড়াই। বনবাংলোর পাশ দিয়ে চলে গেছে গরাতির পথ। গণ্ডার, বাইসনদের খাস তালুক। কোর এলাকায় যাওয়া কঠোরভাবে বারণ। নিষেধ অমান্য করে যাওয়া ঠিক নয়। আমরা বাধ্য ছেলের মতো নিয়মকানুন মেনে চলি। বীটবাবুর সাথে গল্প। বিচিত্র অভিজ্ঞতা যেমন হাতির মুখোমুখি, গণ্ডারের তাড়া, বাইসনের পাল এইসব শুনি। প্রচুর পাখি কীটপতঙ্গ গরুমারায় চোখে পড়লেও পাখি বিষয়ে আমরা একেবারে আনাড়ি। গাছের ডালে পাখি দেখি, গান শুনি। ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখি গাছের উপরে বসছে ঝগড়া করতে করতে আবার উড়ে যাচ্ছে। এক ফাঁকে ভিজিটরস নোটবুকের পাতা উল্টে দেখি। খ্যাত অখ্যাত, বনদপ্তরের কর্তাব্যক্তিরা এসে থেকেছেন। তাদের জন্য খরচ কম। সকলেই দেখিয়েছেন অন ডিউটি। দুপুরে একটু রেস্ট মানে চক্ষু মুদে থাকি। বিকেলে একসঙ্গে লনে বসে গল্প, গান গাই মনের আনন্দে। দেখতে দেখতে অরণ্যে সন্ধ্যা ঘনায়। চৌকীদার ইয়াবড় পেতলের পেটমোটা লম্ফ জ্বেলে দিয়ে যায়। দারুণ লাগছে। বন জুড়ে নানা রকম উদ্ভুত শব্দ, রাতচরা পাখির ডাকাডাকি। রাতে বীটবাবুর অনুরোধে বন্যজন্তু পরিদর্শন মঞ্চে গিয়ে বসি। বনদপ্তরের সার্চলাইট দিয়ে বন্যপ্রাণী দেখানোর চেষ্টা। যত্রতত্র ফোকাস করলেও কিছুই চোখে পড়ল না। বৃষ্টির ফোঁটা টিপটিপ করে পড়তে শুরু করল। দ্রুত বাংলোর ভিতরে প্রবেশ করে চৌকীদারকে অনুরোধ করি "ভোরে চা দিও।" ছেলেটি নিঃশব্দে কাজ করছে দেখে আমাদের ভাল লাগছে। এতটুকু বিরক্তি নেই। হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। কখন ঘুমিয়ে পড়ি মনে নেই। ঘুম ভাঙল চৌকীদারের ডাকে। দরজা খোলার পর শুনি "তাড়াতাড়ি চলুন।" প্রচুর বাইসন এসেছে বাচ্চাকাচ্চা সহ। বিশু, কমল আমার আগেই পৌঁছে গেছে। শাল গাছের কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি, অগুনতি বাইসন সাদা মোজা পায়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে। জীবনে প্রথম বাইসন দর্শন। আমরা হাঁ করে ভ্যাবলার মতন তাকিয়ে আছি। জীবনের সত্যি আনন্দঘন মুহূর্ত। চাড্ডা, মালঞ্চ, পুরন্ডী ঘাসের মধ্যে বাইসনের স্বাভাবিক বিচরণ দু চোখ ভরে দেখি। চৌকীদার এসবের মাঝে ট্রেতে চায়ের পট সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। আর চায়ে চুমুক আর বাইসন দেখা ভোলার নয়। বহুক্ষণ ধরে দেখি। ধীরে ধীরে ঘাস খেতে খেতে ওরা জঙ্গলের ভেতরে চলে যায়। গরুমারার স্মরণীয় সকাল জীবনে প্রথম। অতঃপর অসংখ্যবার বেড়াতে গেছি। থেকেছি কিন্তু প্রথম দিনের স্মৃতি বারবার ভেসে আসে।

গরুমারা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে তবে সেরা লেখাটি মনে হয় বোহেমিয়ান কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "যেতে পারি কিন্তু কেন যাব" অনেকেই পড়েছেন। একটু শোনাই

মাথার উপরে আছে চাঁদ
মূর্তির চরের পাশে পড়ে আছে লবণের ফাঁদ
..... রাতভর পড়ে থাকে কুয়াশার চাদর
জড়ানো বনভূমি
কিছু নেই। শুধু আছে রাতজাগা চাঁদ
গরুমারা ডাকবাংলো ধরে এক গার্হস্থ্যের ফাঁদ

চলচ্চিত্রে, সাহিত্যে, শিল্পীর তুলিতে, ক্যামেরায় বদ্ধ হয়েছে দুর্লভ গরুমারা জাতীয় উদ্যান ও তার বন্যপ্রাণ। কিন্তু বনবাংলোর ধারাবাহিক ইতিহাস, তার ঘটনাবহুল রোমাঞ্চকর অধ্যায় কেউ লিখলেন না। আমিও ব্যর্থ। গরুমারা নামের ইতিহাস, নামকরণের গল্প, অনেক মজার মজার ঘটনা শোনাত লাটাগুড়ির অদূরে মাটিয়াঢ্যামের রামনাথ ওরাওঁ, পঞ্চবটীর অনন্ত। গরুমারা লাগোয়া রামসাই বর্তমানে কালীপুর-মেদলা। একদা লাটাগুড়ি থেকে শাখা রেলপথ প্রসারিত ছিল রামসাই পর্যন্ত। রেলপথের চিহ্ন খুঁজে পাবেন না। নিবিড় শাল অরণ্যের ভিতর দিয়ে প্যাসেঞ্জার, মালগাড়ি আসা-যাওয়া করত। তো রামসাই জনপদ থেকে গোযান, বয়েল গাড়িতে হাটুরের দল জিনিসপত্র নিয়ে জঙ্গলের পথে চালসা, মালবাজার যাতায়াত করত। একবার হাটুরের দল জঙ্গলের ভিতরে তাঁবু ফেলে। আগুন জ্বেলে রাত্রিযাপন করে। এমন সময় রয়্যাল বেঙ্গল ঘাড় মটকে গরু নিয়ে সটান মূর্তির ধারে। হৈ চৈ হলেও কিছু করার ছিল না। সেই থেকে নাম হয় গরুমারা। দিনেদুপুরে বাঘ শুয়ে থাকত রাস্তায়। প্রবীণদের মুখে শুনেছি লাটাগুড়িতে বাঘের অত্যাচারের কাহিনী। এখন মনে হবে গালগল্প। কয়েক বছর আগে বেলেঘাটার শংকরীদাকে নিয়ে গরুমারা বনবাংলো থেকে ফিরছি। এক কিলোমিটার যেতেই পথ আটকে দেয় একদল বাইসন। আমাদের থরহরিকম্প, কী মনে হোল এক কৌটো কড়াপাকের সন্দেশ, বিস্কুট ছুঁড়ে দিই। পালের গোদা একটুখানি শুঁকে দে দৌড়। বাকীরা পেছন পেছন। কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে গেলে আজো সেই গল্প হয়।

গরুমারা বনবাংলো এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের সেরা বনবাংলো। এর গ্ল্যামার, আভিজাত্য, ঐতিহ্য, নব্য সাজগোজ সবকিছু মিলিয়ে লা জবাব। হলং-ও হার মানতে বাধ্য। ২০১০ সালে কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন উন্নয়ন দপ্তর গরুমারা জাতীয় উদ্যানকে দেশের সেরা জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করেন। গরুমারা জাতীয় উদ্যানের মূল কার্যালয় বা প্রকৃতিবীক্ষণ, বেড়ানোর খোঁজ খবর, অনুমতিপত্র বা পারমিট, সবকিছুর ঠেক এখন লাটাগুড়ি। তবে বনবাংলোর অনুমতিপত্র দেন ডি এফ ও, জলপাইগুড়ি, অরণ্য ভবন। যদু মধু হরি যে কেউ গিয়ে রাত্রি যাপন করতে পারবেন যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকে।

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

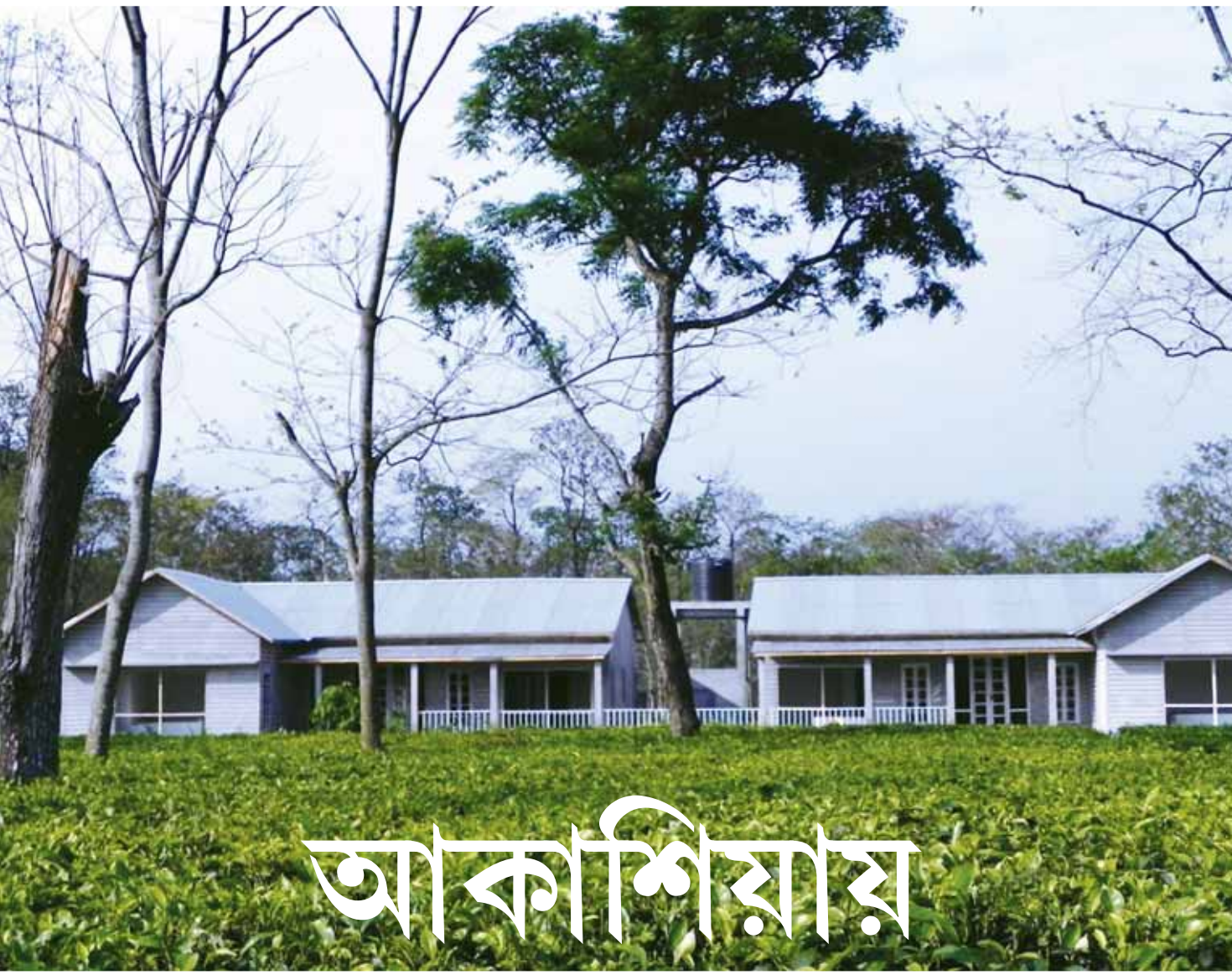

আকাশিয়ায় তিনটি দিন

এবার বসন্তে ডুয়ার্স গিয়েছিলাম। ছিলাম মাদারিহাটে আকাশিয়া রিসর্টে। প্রথমে নামটি শুনেই ভাল লেগেছিল। তারপর গিয়ে আরও মুগ্ধ হলাম। 'আকাশিয়া'— শব্দটির মধ্যেই মুক্ত নির্মল আকাশের ইশারা। বাস্তবেও তাই। চারপাশে চা বাগানের সবুজ উৎসব। রিসর্টের পিছনে খয়েরবাড়ির জঙ্গল। সামনে বিশাল লন। সেখানে সবুজ ঘাসের গালিচা।

রিসর্টের জানালায় বসে মেলে চা বাগানের অপূর্ব দৃশ্য

দলগাঁও স্টেশন থেকে গাড়িতে রিসর্টে পৌঁছালাম। একতলা বাংলো প্যাটার্ন এই প্রাকৃতিক পরিবেশে খুবই মানানসই। ম্যানেজার সাদর অর্ভ্যথনা জানালেন। পূর্বদিকের ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। নরম কার্পেটে পা ডুবিয়ে এগিয়ে গেলাম ঘরে। রুচিসম্মত শৌখিন আসবাবপত্রে সুজ্জিত ঘর এবং বাইরে বসার জায়গাটি। ঘরের কাচের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একদিকে চা বাগান, অন্যদিকে জঙ্গল। চা বাগান এবং জঙ্গলের মেলবন্ধনই আকাশিয়াকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কিছুক্ষণ পরেই গরম চা এসে গেল। চা খেতে খেতে জানালার বাইরে চোখ প্রসারিত করে দিলাম।

দুপুরে খাবার বিপুল আয়োজন দেখে একেবারে বিস্মিত। পশ্চিম দিকে খাবার ব্যবস্থা। বাড়িতে আমাদের কর্মব্যস্ত জীবনে একসঙ্গে এতরকম পদ খাওয়া হয়ে ওঠে না। এখানে ব্যস্ততা নেই। ছুটির আনন্দে সবরকম রান্না রসিয়ে রসিয়ে খেলাম। ম্যানেজার দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালেন। তাঁর আপ্যায়ন ও আন্তরিকতা আমার বড় প্রাপ্তি। খাওয়ার সময় এই অঞ্চলের নানা গল্প শুনছিলাম। বর্ষার পরে ধান ওঠার সময় হাতির আগমন হয়। আশেপাশেও চলে আসে, তবে রিসর্টের কাচের জানালায় নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে পালায়। এখানে বর্ষাকাল দেখার মতো। নদীগুলি তখন ভরে ওঠে। মাছও পাওয়া যায় প্রচুর। গল্প শুনতে শুনতে আহারপর্ব ভালই কাটল।

পরের দিন ঘুম ভাঙল একেবারে ভোরে। বেরিয়ে এলাম বাইরে। পুব আকাশে লালের ছোঁয়া। সূর্য উঠছে। সামনে সবুজ চা বাগান। এগিয়ে গেলাম চা বাগানের দিকে। চা বাগান পেরিয়ে এগিয়ে চললাম খয়েরবাড়ির জঙ্গলের দিকে। এখানে জঙ্গল তত গভীর নয়। হিংস্র জীবজন্তু নেই। আছে প্রচুর পাখি। তাদের কলকাকলিতে জঙ্গল মুখরিত। সকালটা দারুণ কাটল। ফিরে এলাম রিসর্টে। আজ যাব জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে। আকাশিয়া থেকে অল্পকিছু দূরেই। জলদাপাড়ায় হাতির পিঠে অরণ্য ভ্রমণ অসাধারণ অভিজ্ঞতা। সেখান থেকে জয়ন্তী পাহাড় তারপর চিলাপাতা ফরেস্ট। চিলাপাতার জঙ্গল খুব ঘন। ময়ূর, বনমোরগ চোখে পড়ল। এখানেই তৃণভূমিতে দেখলাম গণ্ডারের লড়াই।

রিসর্টে ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। আজ সারাদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছি। প্রকৃতির সান্নিধ্যে অদ্ভুত আনন্দের অনুভূতি জাগছে। রিসর্টে ফিরেও সেই আনন্দের রেশ রয়ে গেল। বাইরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। এরমধ্যে আরও টুরিস্ট এসেছে। তাদের সঙ্গে আলাপ হল। একটি পরিবার লাটাগুড়ি, বিন্দু-ঝালং হয়ে এখানে এসেছে। গল্পে গল্পে কেটে গেল সন্ধে। রিসর্টটিকে এখন বেশ জমজমাট লাগছে। রাতেও খাবারের এলাহি আয়োজন। পরের দিন সকালে আবার গেলাম খয়েরবাড়ি। খয়েরবাড়ির জঙ্গলের ওপাশে বুড়িতোর্সা নদী। সেখান থেকে গেলাম কুঞ্জনগর। দুপুরে রিসর্টে ফিরে বিশ্রাম নিয়ে টোটোপাড়া ঘুরে এলাম। ভারতবর্ষের মধ্যে এখানেই এই আদিম উপজাতির বসবাস। ওপাশে ভুটান। আকাশিয়া থেকে ভুটানের একটি ছোট সুন্দর শহর ফুন্টসোলিং ঘুরে আসা যায়। কোথাও না ঘুরে চুপচাপ যদি

জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্কের ওয়াচ টাওয়ারে পর্যটকের ভিড় ছবি ডাঃ প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

রিসর্টেই বসে থাকতাম তাও সুন্দরভাবে সময় কেটে যেত। চা বাগান আর জঙ্গল নিয়ে আকাশিয়া অনবদ্য।

পরের দিন ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে দেখি বিশাল ব্যাপার। ফুলকো লুচি বেগুনভাজা, আলুর দম আর নানারকম মিষ্টি দিয়ে প্রায় দুপুরের খাবার আয়োজন। আজই চলে যাব। শুনলাম, আজ এখানে সন্ধেবেলায় আদিবাসীদের নাচগান হবে। খাওয়া-দাওয়ারও বিশেষ আয়োজন আছে। আমরা থাকতে পারব না ভেবে খুবই খারাপ লাগল। উদাসী মনটাকে আকাশিয়াতে রেখেই বেরিয়ে পড়তে হল।

ইন্দ্রানী ঘোষাল

দক্ষিণ খয়েরবাড়ির লেপার্ড

আকাশিয়া রিসর্টে থাকা নিয়ে বিস্তারিত জানতে হলে ফোন করুন — হলিডেইয়ার, ফোন ৯৮৩০৪ ১০৮০৮, ০৩৩-৬৫৩৬০৪৬৩। কিংবা মেল করুন holidayaar@yahoo.in

ছবি ডাঃ প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

ডুয়ার্সে ছোট নতুন বাগানই ভবিষ্যৎ

প্রকৃতির কার্পণ্যে এবার ডুয়ার্সে চা উৎপাদন কম তবু...

ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে করুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও বাজারে কিন্তু চায়ের দাম বেড়েছে, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দ্রুত নগরীকরণের ফলে বহুগুণে প্রসারিত হয়েছে চায়ের স্থানীয় বাজার। সেই বিপুল চাহিদায় সাড়া দিতেই যেন বিবর্তনের নিয়ম মেনেই চা পাতা উৎপাদনে এল নতুন যুগ, তা ভালো না খারাপ হল সে কথা বলতে পারবে একমাত্র ভবিষ্যতই।

যেন নিয়ম মেনেই এপ্রিল মাসের গোড়াতেই ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কালবৈশাখীর আবির্ভাব, ঝড়বৃষ্টির তান্ডব লীলায় ঘরবাড়ি গাছপালা ইত্যাদির যা ক্ষয়ক্ষতিই হয়ে থাকুক না কেন, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে চা বাগানের মানুষেরা। বহু বাগানে বেশ কয়েকশ ছায়া গাছ (শেড ট্রি) দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়েছে, তবু চা-বাগানের পরিচালক-চাষি-শ্রমিকরা মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়েছে, যাক্ তবু তো শেষ রক্ষে হল। বৃষ্টির আবির্ভাবে এবার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে নতুন চা গাছের, জলের স্পর্শে দ্রুত গজাবে কচি কচি পাতা। আর তবেই তো বেঁচে থাকবে চা বাগান আর তাকে ঘিরে সুবিশাল এই চা শিল্প। বেঁচে থাকবে ডুয়ার্সের হেরিটেজ। আর অসংখ্য দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষ, যাদের জীবন অতিবাহিত হয় এই চা বাগান তথা চা শিল্পকে ঘিরেই।

সত্যি সত্যিই এবার রীতিমত মাথায় হাত পড়ে গেছে চা বাগানের মালিকদের। শতাব্দী প্রাচীন বিশাল বাগানের ম্যানেজার থেকে ক্ষুদ্র চা-চাষি সকলেরই। সেই কবে, সেপ্টেম্বরে বর্ষা গেছে, তারপর ছ'মাস তো জলের দেখা নেই। শুকিয়ে গিয়েছে মাটি, সবুজ বাগানে শুরু হয়েছে পোকার উপদ্রব। একে কচিপাতা কুঁড়ির দেখা তো মিলছেই না উপরন্তু নতুন পাতা যেটুকু বেরোচ্ছে তা খেয়ে ফেলছে এইসব পতঙ্গের দল। বৃষ্টি তথা প্রবল জলধারাই এই দুই সমস্যার একমাত্র সমাধান। যে সব বাগানে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা আছে সেখানে সেচের বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু হাজার সমস্যায় জর্জরিত পুরনো বাগানে কিংবা ছোট বা মাঝারি চা চাষির তা ক্ষমতায় কুলোবে কী করে? অতএব আকাশের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া তাদের আর কীই বা করার আছে বলুন! আর এসবের ফলস্বরূপ চা-মহল ও বিশেষজ্ঞ মহলের আশংকাই সত্য হয়ে দাঁড়ায়, এবার উত্তরবঙ্গের চায়ের সামগ্রিক ফলন অনেকটাই কম হবে।

তাদের মতে অন্যান্যবার সাধারণত যা হয়ে থাকে, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে কয়েক পশলা বৃষ্টির ফলে মরসুমের শুরুতেই বছরের মোট চা উৎপাদনের প্রায় দশ শতাংশ উঠে আসে। যেমন গত বছরই উত্তরবঙ্গের ছোট-বড়-মাঝারি পুরনো-নতুন বাগান থেকে সব মিলিয়ে প্রায় বত্রিশ কোটি কেজি চা পাতা উৎপাদন হয়েছিল। জলপাইগুড়ি জেলাতেই উৎপাদন হয়েছে তার পঁচাত্তর শতাংশ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এবার জানুয়ারি থেকেই বৃষ্টির দেখা নেই। ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন থেকে আশংকা করা হচ্ছিল, পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠতে পারে যে গত বছরের তুলনায় পঞ্চাশ শতাংশ উৎপাদন হবে কি না সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।

উত্তরবঙ্গে চা শিল্পের শোচনীয় চিত্র বহুদিন ধরেই প্রত্যক্ষ করছে মানুষ। এই ডুয়ার্সেই ইংরেজ আমলে শুরু হয়েছিল ১৭০টি চা বাগান। দিনের পর দিন বনেদিয়ানার অবাস্তব ব্যয়ভারে সেগুলির বেশির ভাগই ভীষণ রুগ্ন হয়ে পড়ে। তারপর বিক্রি হয়ে যায় হাল আমলের ব্যবসায়ীদের কাছে, ঐতিহ্য-রাজকীয়তা রক্ষার চাইতে যত দ্রুত সম্ভব বিনিয়োগের প্রত্যাবর্তন যাদের অধিক কাম্য। ফল যা হওয়ার তাই হল। নানা সমস্যায় জড়িত এইসব বাগানের সঠিক পরিচর্যা বা ভবিষ্যতের কথা সেই সব বণিকশ্রেণির মানুষ কখনই ভাবেনি। মুনাফার স্রোত যে মুহূর্তে ক্ষীণ হয়েছে সেই মুহূর্তে বাগান বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে পরবর্তী স্তরের বণিকদের কাছে। যখন মুনাফা কমছে অথচ শ্রমিকদের বহু দিনের ন্যায্য চাহিদা বা পাওনা অস্বাভাবিক অঙ্কে দাঁড়িয়েছে তখনই চা শিল্পের সংকট ঘনিয়ে এসেছে। অথচ যেসব বাগান কর্পোরেট মালিকানায় বা সুস্থ পরিচালন ব্যবস্থায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নবীকরণ হয়েছে, সঠিক বৈজ্ঞানিক পরিচর্যায় বেড়ে উঠেছে সেখানে উৎপাদনও বেড়েছে, লভ্যাংশের হার কমলেও শ্রমিকরা ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়নি। বাকিদের অবস্থা কিন্তু দিনকে দিন খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়েছে। মালিকপক্ষ বাগান-ফ্যাক্টরি ছেড়ে পালিয়েছে। দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে শ্রমিক মৃত্যু নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে, একের পর এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে চা বাগান ঘিরে। কোনও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বা এযাবৎ কোনও সরকারি হস্তক্ষেপ সেই সমস্ত সর্বহারা শ্রমিকদের ভাগ্যকে অন্ধকার থেকে ফেরাতে পারেনি।

ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে এইরকম করুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও বাজারে কিন্তু চায়ের দাম বেড়েছে, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দ্রুত নগরীকরণের ফলে বহুগুণে প্রসারিত হয়েছে চায়ের স্থানীয় বাজার। সেই বিপুল চাহিদায় সাড়া দিতেই যেন বিবর্তনের নিয়ম মেনেই চা পাতা উৎপাদনে এল নতুন যুগ, তা ভালো না খারাপ হল সে কথা বলতে পারবে একমাত্র ভবিষ্যতই। এবার বাগানের সঙ্গে আর ফ্যাক্টরি নয়, শ্রমিক নিয়ে অযথা জটিলতা নয়। কেবল ডুয়ার্স নয়, উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও ধান চাষের জমিতেও শুরু হল চায়ের চাষ। চা শিল্পের সংকট যখন ঘনীভূত হতে শুরু করেছিল, পরিস্থিতি ক্রমশই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল তখন থেকেই শুরু। গত পঁচিশ বছরে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুরে

যে ভাবে একের পর এককালের বিখ্যাত সব চা বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘন ঘন দুঃসংবাদ আসে খবরের কাগজের পাতায়, বুকের মধ্যে সত্যিই কাঁপুনি জাগে — হাজার শ্রমিকের কান্না জড়ানো পুরনো নামজাদা বাগানগুলি একদিন ইতিহাসের বিস্মৃতিতে হারিয়ে যাবে, কালের নিয়ম মেনে মাটিতে মিশে যাবে

এই নতুন বাগানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় চল্লিশ হাজার। জলপাইগুড়ি-কোচবিহারেই রয়েছে তার ষাট শতাংশ বাগান। শুনে এতটুকুও চমকাবেন না, এই সব ছোট ছোট নতুন বাগান থেকে গত বছর যে চা পাতা উৎপাদন হয়েছিল তা উত্তরবঙ্গের মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেকই বলা চলে।

ভেবে দেখুন, চা চাষ করেই এইসব ক্ষুদ্র চাষির দায়িত্ব শেষ, বাকিটা বুঝেনেবে অন্যরা অর্থাৎ প্রসেসিং ফ্যাক্টরিগুলি। আইনের ফাঁক দিয়েই চলছে এই ব্যবস্থা। কারণ মার্কেট চাইছে আরও অনেক অনেক বেশি, চালু মার্কেটের স্বার্থেই কড়া পদক্ষেপের পক্ষে যাবে না কেউই। আর অনেক ব্যথাও তো আছে এইসব ক্ষুদ্র বাগানগুলোর। যেমন প্রথমত সাধ্য কম, সেচের খরচ যোগাতে পারবে না অতএব প্রকৃতির খামখেয়ালের ওপর অনেকটাই নির্ভর করবে উৎপাদন তথা রোজগার। দ্বিতীয়ত কোয়ালিটি উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ কোনওটাই হাতে নেই এদের। কোয়ালিটি চা উৎপাদন করার কোনও জ্ঞান বা শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা যেমন নেই এই ক্ষুদ্র চাষিদের, তেমনি সেই কোয়ালিটিকে বরাবরের জন্য নিয়ন্ত্রণ করার উপায়ও জানা নেই তাদের। গুণগত মান না বাড়ালে ভবিষ্যতে যে প্রতিযোগিতা বা অসুবিধের সম্মুখীন হতে হবে সে কথা স্বীকারও করছেন অনেকেই। কিন্তু সবারই এই মুহূর্তে বিরূপ প্রকৃতির বুকে টিকে থেকে উৎপাদন বাড়ানোই আপাতত একমাত্র লক্ষ্য।

যদিও আশার বাণী মেলে কোনও অভিজ্ঞ প্ল্যান্টার তথা চা বাগান ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বললে, এইসব ছোট বাগানেও নাকি ভবিষ্যতে কোয়ালিটি উৎপাদন সম্ভব, তবুও আমরা বলি, কোয়ালিটির অধিকারটুকু আপাতত না হয় সেই সব বনেদি বাগানগুলির জিম্মাতেই থাক। যে ভাবে একের পর এক এককালের বিখ্যাত সব চা বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘন ঘন দুঃসংবাদ আসে খবরের কাগজের পাতায়, বুকের মধ্যে সত্যিই কাঁপুনি জাগে — হাজার শ্রমিকের কান্না জড়ানো পুরনো নামজাদা বাগানগুলি একদিন ইতিহাসের বিস্মৃতিতে হারিয়ে যাবে, কালের নিয়ম মেনে মাটিতে মিশে যাবে কিংবা প্যাঁচার বাসা হয়ে জেগে থাকবে কোনও ডাকসাইটে ম্যানেজার-বাংলোর ভগ্নাবশেষ। তেমনই নতুন প্রজন্মের চা-চাষিরা বয়ে নিয়ে যাবে ডুয়ার্সের আসল ঐতিহ্যকে ভবিষ্যতের আঙ্গিনায়।

সুনন্দ রায়

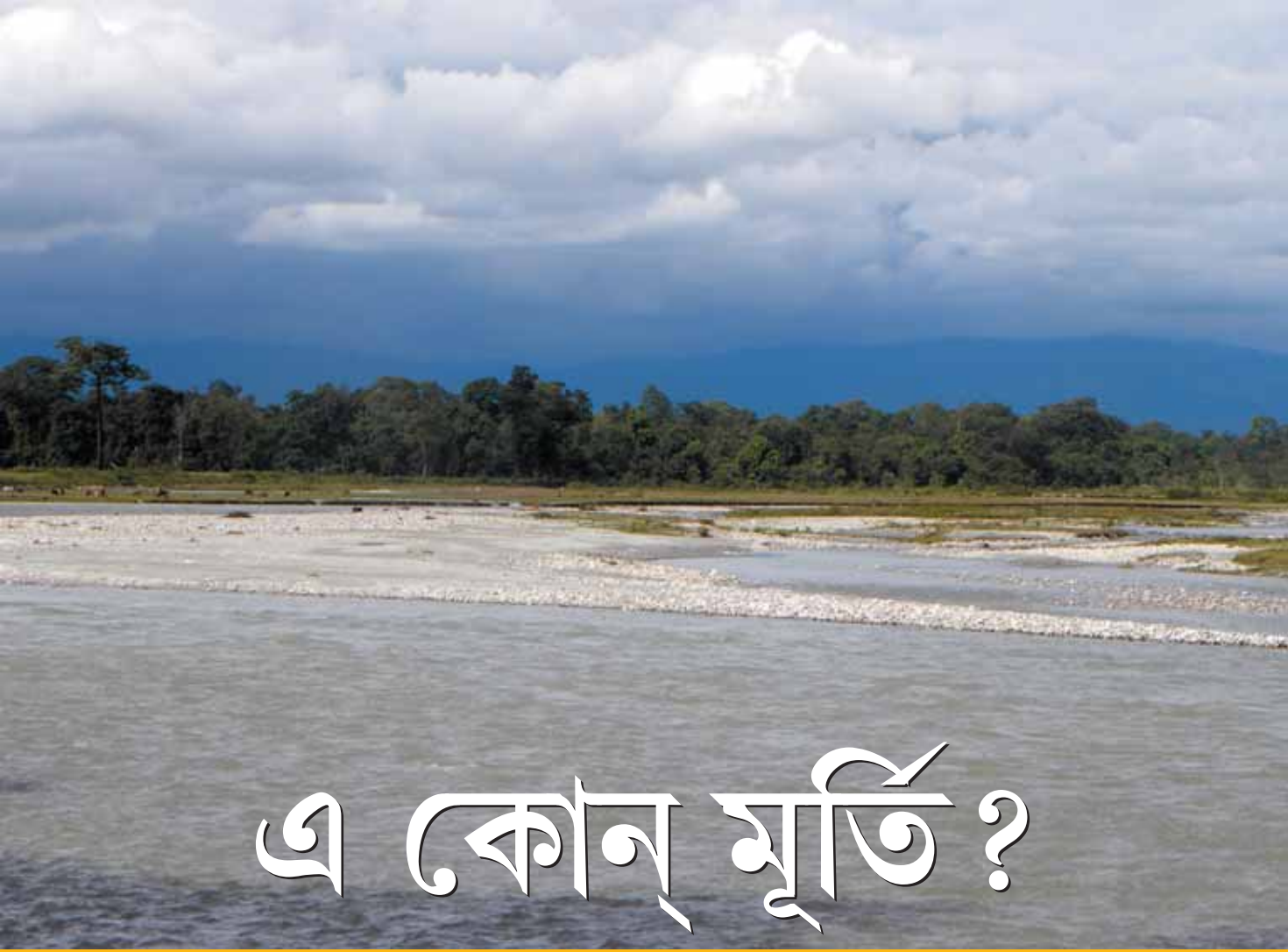

এ কোন্ মূর্তি ?

সারা বছর যে শীতে শীর্ণ জলধারা বর্ষায় তার রূপ বদলে যায়। যারাই এসময় ডুয়ার্স বেড়াতে আসেন তারাই মূর্তির জলোচ্ছাস দেখে অবাক হয়ে যায়। বুনো লতাপাতারা যেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে দখল করে নেয় পথচলার অনেকটাই। ভাবখানা যেন, এখন তো আমাদের জমানা। সবুজে সবুজে ডুয়ার্সের রূপ এসময় সত্যিই সাধারণ পর্যটকদের অচেনা। কারণ এসময় জঙ্গল বন্ধ থাকে, অতএব খোলা গাড়িতে চেপে জানোয়ার দেখতে বেরনোর 'মজা' নেই। জঙ্গল বন্ধ থাকে বলেই বোধহয় প্রকৃতি এমন উন্মুক্তমনা হয়ে তার রূপ মেলে ধরে। ডুয়ার্সের এই অচেনা সৌন্দর্য উপভোগ করার সেরা জায়গা এক কথায় মূর্তি।

নদীর ওপারেই গরুমারা জঙ্গলের হাতছানি, ভোরের কুয়াশায় বা সন্ধ্যার আবছায়ায় চোখে পড়ে যেতে পারে হাতির দলের চলাফেরা। পাশেই বন্যপ্রাণ বিভাগের এলিফ্যান্ট ক্যাম্প। বিকেলে হাতিদের নদীতে চান বা চানের পর সাজগোজ এবং আহারপর্ব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা যায়। মূর্তি গ্রামটিও চমৎকার, মূলত রাজবংশী আর আদিবাসী মানুষের বসবাস। গত কয়েক বছর ধরেই মূর্তিতে প্রকৃতি পর্যটম

বেশ জমে উঠেছে। এক সময় বন উন্নয়ন নিগমের হোটেল বনানী ছাড়া আর কিছু ছিল না এখন সেখানে বন্যপ্রাণ বিভাগ আর পর্যটন দপ্তরের রিসর্ট তো বটেই, বেশ কিছু ছোট বড় মাঝারি বেসরকারি হোটেল-রিসর্ট গড়ে উঠেছে, সারা বছরই থাকে পর্যটক। পর্যটন দপ্তরের লজ বা বেসরকারি হোটেল বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন ডুয়ার্স ইকো ওয়ান্ডার্স ৬৫৩৬ ০৪৬৩ নম্বরে।

ইতিহাসের ডুয়ার্স হারাতে চলেছে চেচাখাতা

ডুয়ার্স মানে শুধু বনজঙ্গল-পশুপাখি নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রাচীন ইতিহাসও। দুঃখের বিষয়, স্থানীয় মানুষজন থেকে কর্তৃপক্ষ সকলেই এ ব্যাপারে উদাসীন। তাই ইতিহাসের নিদর্শনগুলির ক্ষয় এবং লয় দুই-ই ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। এমনই একটি হতমান সাক্ষী হল ডুয়ার্সের চেচাখাতা দুর্গ। দীর্ঘকালের প্রশাসনিক অজ্ঞতা, অবহেলা আর জবরদখলে তার শেষ চিহ্নটুকুও মুছে যাওয়ার দাখিল।

নবগঠিত আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলার পশ্চিমে যেখান দিয়ে পূর্ত দপ্তর বা পি ডব্লু ডি-র রাস্তা গিয়েছে তার উত্তর-পশ্চিম দিকে ধানখেতের মধ্যে দেখা যায় ঐতিহাসিক চেচাখাতা দুর্গের কঙ্কাল বা মাটির দুর্গ-প্রাকার। ছয়-সাত বছর আগেও সেই দুর্গপ্রাকারের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, আজ তাও নেই। অথচ এই দুর্গের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে কোচবিহারের মহারাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের নাম।

অষ্টাদশ শতকের শেষপর্বে এই চেচাখাতা দুর্গেই কোচবিহারের মহারাজা আসতেন প্রতিবেশি ভুটান-রাজ বা ভুটানের রাজপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বছরে একবার মোলাকাত করতে। চলত রাজকীয় খানাপিনা। উপঢৌকন বিনিময়। যাকে বলে বাৎসরিক রাজকীয় সৌজন্য সাক্ষাৎ। কিন্তু অকস্মাৎ এ রকম এক সৌহার্দ্যের আসরেই কাঁটা পড়ল। এখানেই কোচবিহারের রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ভুটানের প্রতিনিধিরা তাঁকে বন্দি করল এবং বক্সা হয়ে তাদের তৎকালীন রাজধানী পুনাখায় ফিরে গেল। চেচাখাতা দুর্গে এভাবে বন্দি হওয়া মহারাজাকে ভুটানের কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্যই কোচবিহার রাজ্য ইংরেজদের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয় ও পরিণামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির করদ রাজ্যে পরিণত হয়ে আপন স্বাধীনতা হারায়।

ওই সময় ভুটান আরও একটি কাণ্ড করে। তারা নাবালক বীজেন্দ্রনারায়ণকে কোচবিহারের রাজা বলে ঘোষণা করে এবং তাঁকে চেচাখাতা দুর্গে এনে নিজেদের অধীনে রেখে দেয় ও সেই সঙ্গে একতরফা ভাবে চেচাখাতা দুর্গকেই কোচবিহারের রাজধানী বলে ঘোষণা করে দেয়। এত টানাপোড়েনের ধকল নাবালক বীজেন্দ্রনারায়ণের সহ্য হল না। তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তার আগে অবশ্য এখানেই কুমার ভগবন্তনারায়ণের বাহিনীর সঙ্গে ভুটানের সৈন্যবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। কুমারের সৈন্যদের হাতে বহু ভুটানি সেনা নিহত হয় এবং সেই যুদ্ধে ভুটান পরাজয় বরণ করে। পরে ভুটান-রাজ ১০ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে চেচাখাতা দুর্গ অবরুদ্ধ করেন এবং তাদের সংখ্যার কাছে কুমার ভগবন্তনারায়ণের কোচ সেনাদল পরাস্ত হয়। চেচাখাতা দুর্গ আবার ভুটানের অধিকারে চলে যায়।

এ রকম একটা পরিস্থিতিতেই কোচবিহার ইংরেজদের সাহায্য চাইতে বাধ্য হয়। ১৭৭৩ সালে ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে ভুটানের যুদ্ধ হয় এবং ভুটানি সেনাবাহিনীকে হটিয়ে ইংরেজরা চেচাখাতা দুর্গ আর বক্সা দুর্গ দখল করে। তবে ইংরেজদের এই অভিযানে যথেষ্টই বেগ পেতে হয়েছিল। কারণ একদিন রাতে এই চেচাখাতা দুর্গেই অতর্কিতে হানা দিয়ে ভুটানি সেনারা ইংরেজদের বহু সৈন্যকে হত্যা করে কেল্লার দখল নিয়ে নেয়। পরে ইংরেজরা এটি পুনর্দখল করে।

ভুটানের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে মহারাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ প্রথমে এই চেচাখাতা দুর্গেই পদার্পণ করেন এবং এই দুর্গে দাঁড়িয়েই তিনি কোচবিহারের করদ রাজ্যে পরিণত হওয়ার খবর পান। সেই খবর শুনে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন, মুন্সি জয়নাথ ঘোষের রাজোপাখ্যানে তার উল্লেখ আছে। মন্তব্যটি এই — "বাবা নাজির, রাজ্য কেন কোম্পানিকে দিলে? ... বিশ্বসিংহের বংশধরের একজনের পরিবর্তে না হয় অন্য একজন রাজা হইত। স্বয়ংসিদ্ধ রাজা ছিলাম, এখন অন্যের অধীনতা কী প্রকারে স্বীকার করিব?" এই ক্ষোভে ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ তখন নাকি রাজা হতেও অস্বীকার করেছিলেন।

ইংরেজরা সব সময়েই তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিত। সেই মতো ভুটানের সঙ্গে তারা তখন অর্থনৈতিক সন্ধি স্থাপন করে চেচাখাতা দুর্গ সমেত গোটা ডুয়ার্স

ভুটানকে দিয়ে দেয়। এ নিয়ে হীনবল কোচবিহার রাজ্যের কোনও আপত্তিই তাদের কাছে পাত্তা পায়নি। এই সন্ধির ফলে চেচাখাতা দুর্গই হয়ে দাঁড়ায় ভুটান-কোচবিহার সীমানা ও ভুটানের নতুন সীমান্ত দুর্গ।

এর প্রায় একশ বছর পর দ্বিতীয় ভুটান যুদ্ধে (১৮৬৪-৬৫) ভারতের ব্রিটিশ রাজ ভুটানকে পরাজিত করে এবং চেচাখাতা, বক্সা দুর্গ সমগ্র ডুয়ার্স কোচবিহারকে ফেরত না দিয়ে নিজেদেরই দখলে নিয়ে নেয়। অর্থাৎ ভুটানের কবল থেকে ডুয়ার্স ফিরে এল বটে, কিন্তু তা আর কোচবিহারের অন্তর্ভুক্ত হল না, সরাসরি চলে গেল ব্রিটিশের মুঠোয়। তখন থেকেই চেচাখাতা দুর্গ পরিত্যক্ত হল। বক্সা দুর্গকেই ব্রিটিশরা করল মহকুমা সদর।

এত ইতিহাসময় যে চেচাখাতা, স্বাধীনতার পর সরকারি খাসজমি হিসেবে তার ঠাঁই হয়েছে মৌজা ম্যাপে। হেরিটেজ হিসাবে কোথাও কোনও উল্লেখটুকুও নেই। অথচ ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত মার্কিন বিমান বাহিনীর একটি মানচিত্রে দুর্গটির অবস্থান বেশ পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ, দীর্ঘকাল ধরে সাধারণ মানুষের চোখে যা কি না মাটির দেওয়াল ঘেরা চাষের জমি, স্যাটেলাইটের কল্যাণে তা মার্কিন বিমান বাহিনীর ম্যাপে প্রায় নিখুঁত ভাবে একটি দুর্গ বলেই ধরা পড়েছে। অথচ তা নিয়ে আমাদের দেশে কোনও রকম আগ্রহ নেই, কৌতূহল নেই।

বিশেষ করে প্রশাসনের ঔদাসীন্য আর অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে স্থানীয় নেতা-মাতব্বরদের উসকানিতে এক শ্রেণির জবরদখলকারী এই ঐতিহাসিক নিদর্শনের আরও ক্ষতিসাধন করেছে। আট-দশ বছর যাবৎ এটা একনাগাড়ে চলছে। দুর্গের ভিতরকার ছোট দুর্গ বা দুর্গাধিপতির বাসস্থানের উঁচু মাটির প্রাকার প্রায় সমতলে পরিণত হয়েছে। দুর্গের ভিতরে জবরদখলকারীরা বসবাসের জন্য বাড়িঘরও তৈরি করেছে। পঞ্চায়েত থেকে উঁচু মাটির প্রাকার কেটে গড়ের ভেতরে যাওয়ার রাস্তা বানানো হয়েছে। আরও কিছু দিন এভাবে চললে প্রাকার ও পরিখার যতটুকু অবশিষ্ট আছে, তাও বিলীন হয়ে যাবে। কালের গর্ভে চিরতরে হারিয়ে যাবে ঐতিহাসিক চেচাখাতা দুর্গ।

নিজস্ব প্রতিনিধি

সবার সেরা গরুমারার সেরা ঠিকানা

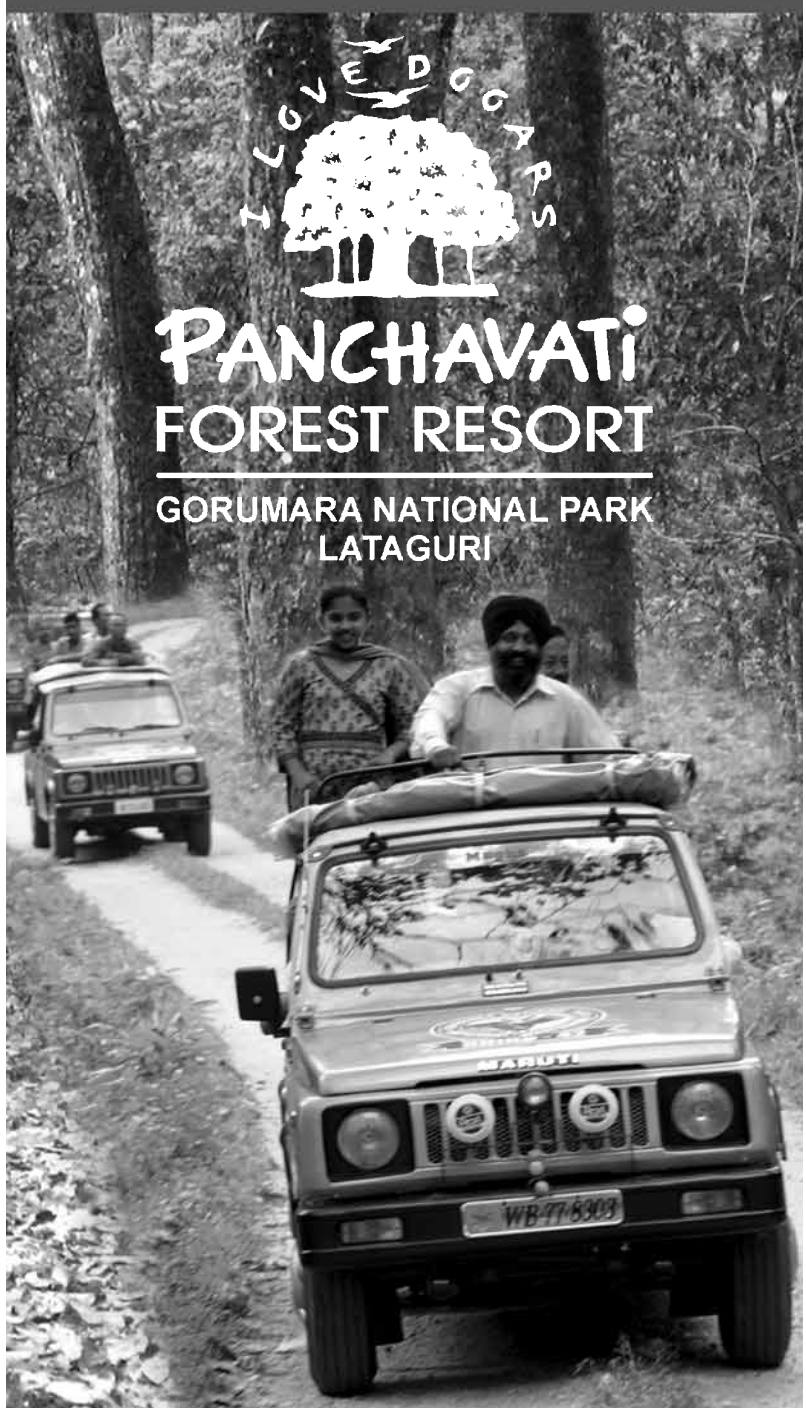

Gorumara National Park, Post: Lataguri, District: Jalpaiguri 735101, India
Phone : 03561-266284 (Resort) Phone : 0353-2662254 (City Office, Siliguri, WB)
Cell : 98320-68303 / 98320-60164 / 94743-83828
E-mail: panchavatiforestresort@gmail.com / info@panchavatiforestresort.com
Website: www. panchavatiforestresort.com

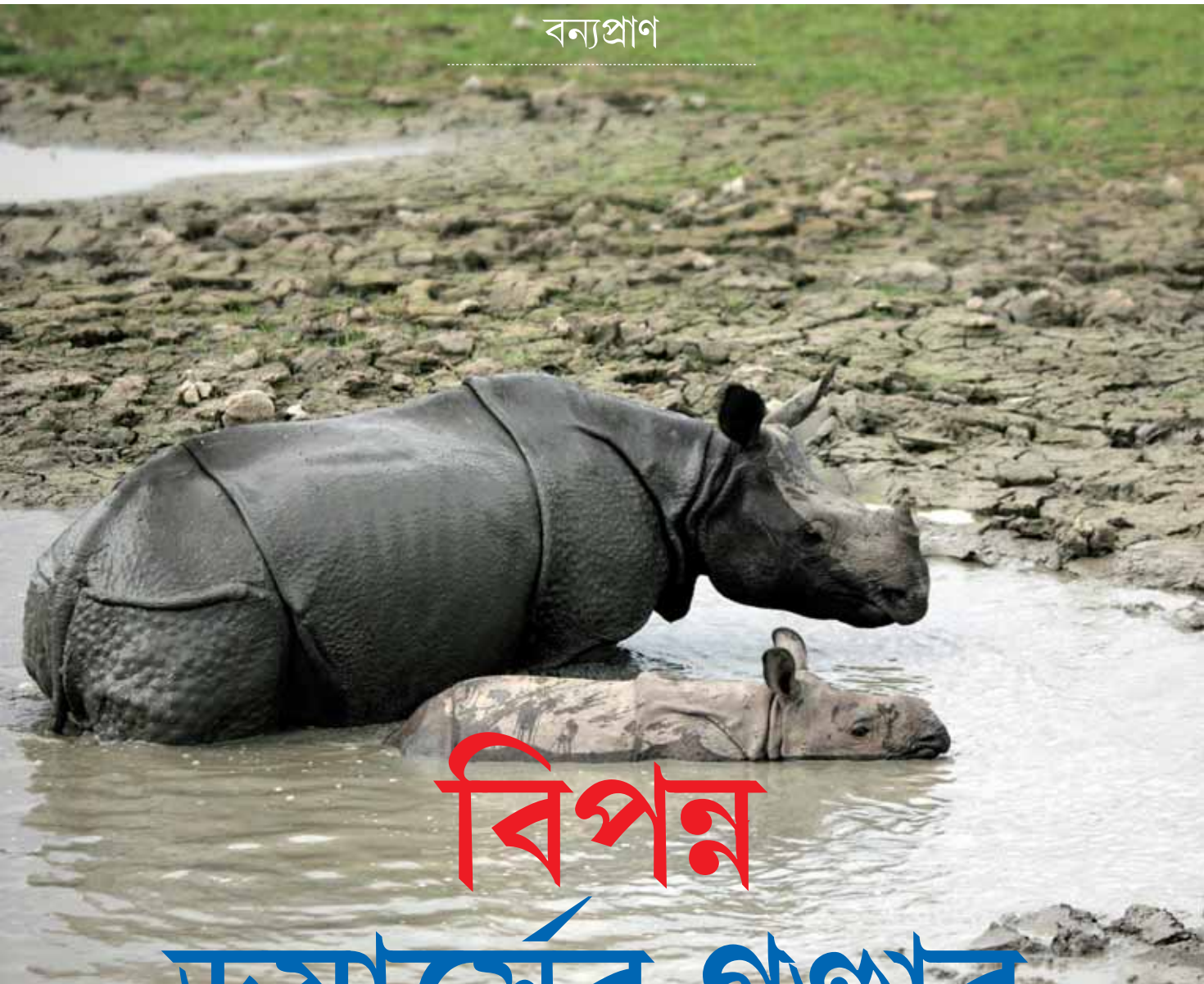

বিপন্ন ডুয়ার্সের গণ্ডার

(১)

তখন দিন-শেষের অন্তিম রক্তিমাভা-টুকু ছুঁয়ে যাচ্ছিল সুউচ্চ-সাল-শিশু-সেগুন গাছের মাথা। চারপাশ মুখরিত হয়ে উঠছিল ঘরে ফেরা পাখির কলরবে। চিলাপাতা জঙ্গলের মাটির এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছিল আমাদের সাফারি জীপটি। কখনো দেখছিলাম ঝোপের ফাঁক দিয়ে বারকিং ডিয়ার এর ভীত চকিত চাহনি, কখনো বা রাস্তা পেরোতে গিয়ে সম্বরের থমকে দাঁড়ান। আমার সহযাত্রীরা অধিকাংশই পর্যটক বা ফটো-শিকারি। ফলে, ক্যামেরার শাটার পড়ছিল মুহুর্মুহু। যদিও আমি খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে এবং খানিকটা অভ্যাসবশতই শাটার টিপে যাচ্ছিলাম। আমার চোখ খুঁজছিল অন্য কিছু। আসলে যার খোঁজে এখানে আসা, তারই তো দেখা পাইনি এখনও।

ছবি শৌভনিক চক্রবর্তী

চিলাপাতার জঙ্গলে এটা আমার প্রথম আসা নয়, আগেও এসেছি বহুবার। কিন্তু এবার এসেছি এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। ডুয়ার্সের গণ্ডারদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং এদের স্বাভাবিক-বাসভূমিতে এদের ফটো তুলতে। চিলাপাতা হল একশৃঙ্গ গণ্ডারের বাসস্থান হিসেবে বিখ্যাত জলদাপাড়া ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারির (জলদাপাড়াকে অতি সম্প্রতি ন্যাশনাল পার্কের সম্মান দেওয়া হয়েছে) লাগোয়া বনাঞ্চল, যা মাত্র কিছুদিন হোল প্রচারের আলোয় এসেছে। উত্তর প্রদেশের দুধওয়া ন্যাশনাল পার্কের অল্প কয়েকটি গণ্ডার বাদ দিলে ভারতে আসামের পর ডুয়ার্সের জলদাপাড়া ও গরুমারা ন্যাশনাল পার্কই হোল ভারতীয় একশৃঙ্গ গণ্ডারের (rhinoce) দ্বিতীয় ও শেষ বাসভূমি।

আমাদের জীপ জঙ্গলের আর গভীরে ঢুকে এসে পৌঁছলো নদীতীরে এক নজরমিনারের কাছাকাছি। এ জায়গাটা স্থানীয়ভাবে নামে 'CC-Line' পরিচিত। এখানে তোরসা নদীসমতলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চিলাপাতা ও জলদাপাড়ার জঙ্গলকে আলাদা করেছে। লোহিত-সূর্য তখন নদীর ওপারে দূর জঙ্গলের মাথায় হারিয়ে যেতে বসেছে, মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখছিলাম সেই অপরূপ দৃশ্য, হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলাম আমাদের জীপের অতর্কিত থেমে যাওয়ায়। বিস্তীর্ণ তোরসার চরে জলাভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি স্ত্রী ও দুটো পুরুষ গণ্ডার। ভালো করে লক্ষ্য করে বুঝলাম, এরা এসেছে মিলনের উদ্দেশ্যে, সঙ্গিনীর ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার অভিলাষে। তখন আলো যথেষ্টই কমে এসেছে, দূরত্বটাও বেশ অনেকটা। তবুও এরা খোলা জায়গায় এলে কয়েকটা শট নিলাম। এরাই আমার এই সফরের প্রথম গণ্ডার। তাই ভালো ফটো না পেলেও এই আকস্মিক প্রাপ্তি আমার মনে থাকবে চিরকাল। আসলে চিলাপাতায় গণ্ডার দর্শনের আশা আমার নিজেরও খুব বেশি ছিল না। এই জঙ্গলে গণ্ডারের ঘনত্ব খুবই কম। যে এক-দুটোর দেখা পাওয়া যায় তাদের অধিকাংশই জলদাপাড়া থেকে ছিটকে আসা গণ্ডার। অথচ বিগত শতকের প্রথম ভাগেও চিলাপাতায় গণ্ডারের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট। এমনকি গণ্ডারের আরেকটি প্রজাতি, Rhinoceros sondalcus-কেও উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে পাওয়া যেত যার শেষ সদস্যটিকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এই চিলাপাতা জঙ্গলেই দেখা গিয়েছিল।

আলো যথেষ্টই কমে আসছিল, তাই সেদিনের মতো আমাদের সাফারিতে ইতি দিলাম। রাতে ডিনার সেরে রিসর্টের বাগানে পায়চারী করছিলাম। রাতের অরণ্য তার ভয়ঙ্কর বন্যতা আর সৌন্দর্যের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে যেন আমার সমগ্র চেতনা গ্রাস করতে চাইছিল। কিন্তু মনের মধ্যে এক অজানা অস্বস্তি আমাকে তার সাথে একাত্ম হতে দিচ্ছিল না। কেবলই ভাবছিলাম একসময় যে গণ্ডারেরা পাকিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণি থেকে হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ধরে মায়ানমার অবধি অবাধে বিচরণ করত, আজ তাদের মাত্র ৩০০০ সদস্য ভারত ও নেপালে কোনক্রমে টিকে রয়েছে। মাত্র ২০২টি গণ্ডার রয়েছে সারা পশ্চিমবঙ্গে এবং তার সবগুলোই রয়েছে কেবল ডুয়ার্সের এই দুটি অরণ্যে। অথচ, এক সময় গণ্ডার পাওয়া যেত দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন, সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে; অন্তত প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ কিন্তু তাই বলে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও ডুয়ার্সের তিনটি নদী অববাহিকায় গণ্ডারের তিনটি সুস্পষ্ট ও পৃথক বাসভূমি ছিল — (১) সংকোশ-রায়ডাক অববাহিকা (২) তোরসা অববাহিকা ও (৩) জলঢাকা-ডায়না অববাহিকা। কুচবিহারের মহারাজা নীপেন্দ্রনারায়ণ ১৮৭১ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে এ অঞ্চলে শিকার

নদীর এই প্রান্তে অরণ্য হলেও উল্টো দিকে বিস্তীর্ণ গ্রাসল্যান্ড। সেখানেই দেখা মিলল জল খেতে আসা মা ও গণ্ডার শিশুটির। মাহুতকে বলে খুব সাবধানে এগিয়ে গেলাম ওদের পাস কাটিয়ে যাতে ওরা বিরক্ত না হয়। ছবি তোলার সুযোগ থাকলেও কেন যেন ইচ্ছে করছিল না ওদের এই একান্ত নিজস্ব মুহূর্তের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে। তবুও অভ্যাসবশত ক্যামেরা তাক করলাম, কিন্তু মায়ের দৃষ্টি এড়ানো গেল না

পশ্চিমবঙ্গে গণ্ডারের সর্বনিম্ন সংখ্যা। এরপর থেকে, মূলত সরকারি প্রচেষ্টায় ২০১২ সালে ডুয়ার্সের জলদাপাড়ায় ১৬০টি ও গরুমারা ন্যাশনাল পার্কে ৪২টি, অর্থাৎ মোট সংখ্যা ২০২টি তে দাঁড়িয়েছিল।

(২)

আমার পরবর্তী গন্তব্য ছিল গরুমারা। বুক করেছিলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তরের 'গাছবাড়ি'। এখান থেকেই হাতি সাফারি করা হয়। আমি ব্যাক্তিগত ভাবে জীপ-সাফারির থেকে হাতি সাফারিই বেশি পছন্দ করি, কারণ প্রথমত এটা অনেক পরিবেশ-বান্ধব, আরও বড় কথা হোল এতে বন্য জন্তুদের বিরক্ত না করেও তাদের অনেক কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায়। পরদিন সকালে হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। জঙ্গলে তখনও ঠিকঠাক ফোটেনি ভোরের আলো। চারদিক মুখরিত হয়ে আছে সদ্য ঘুম ভেঙে ওঠা পাখিদের কলরবে। হাতির পিঠে চড়ার প্রাথমিক অস্বস্তি কাটিয়ে আমি তখন অনেকটাই সাবলীল ভাবে উপভোগ করছি ভোরের গরুমারা অভয়ারণ্যকে। দু'একটি বাঁদরের লাফালাফি, ময়ূরের পদচারণ বা চকিতে হরিণের ছুটে পালানোকে পেছনে ফেলে আমরা এসে পৌঁছলাম 'মূর্তি' নদীর ধারে। নদীর এই প্রান্তে অরণ্য হলেও উল্টো দিকে বিস্তীর্ণ গ্রাস-ল্যান্ড। সেখানেই দেখা মিলল জল খেতে আসা মা ও গণ্ডার শিশুটির। মাহুতকে বলে খুব সাবধানে এগিয়ে গেলাম ওদের পাস কাটিয়ে যাতে ওরা বিরক্ত না হয়। ছবি তোলার সুযোগ থাকলেও কেন যেন ইচ্ছে করছিল না ওদের এই একান্ত নিজস্ব মুহূর্তের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে। তবুও অভ্যাসবশত ক্যামেরা তাক করলাম, কিন্তু মায়ের দৃষ্টি এড়ানো গেল না, নদীর মাঝামাঝি আসতেই দুজনে ছুট লাগাল ঘাসবনের গভীর আড়ালে। শিশুকে বহিরাগত আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের পলিসিমেকারদের আরও সচেষ্ট না হলে অদূর ভবিষ্যতে এখানে গণ্ডারদের অস্তিত্ব সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। গরুমারার ৭০ বর্গ কিমি অঞ্চলের মধ্যে মাত্র ২০ বর্গ কিমি অঞ্চলে আর জলদাপাড়ায় মোটামুটি ১৫০ বর্গকিমি অঞ্চলে তৃণভূমি আছে। বড় গাছের জঙ্গল খুব দ্রুত এই তৃণভূমির দখল নিচ্ছে। তৃণভূমি রক্ষা ও নতুন তৃণভূমি না

অভিযান চালিয়ে ২০১টি গণ্ডারকে মারেন। বক্সা টাইগার রিজার্ভের পানবাড়ি ও দক্ষিণ ভক্কা ব্লকে গণ্ডারের অস্তিত্বর কথা বনদপ্তরের ১৯৬৭-৬৮ বার্ষিক রিপোর্টেও উল্লেখ করা হয়েছে। কুচবিহারের পাতলাখাওয়া অরণ্যে ১৯৮৫ সালে শেষ গণ্ডারটি মারা যায়। রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৮৬ সালে জলদাপাড়ায় ১৪টি ও গরুমারা ন্যাশনাল পার্কে ৮টি, অর্থাৎ মোট সংখ্যা ২২টি তে দাঁড়ায়, যা এ অবধি

ছবি শৌভনিক চক্রবর্তী

EKHON DUARS, Vol-1, Issue-3, DL No.-65, dtd. 24.03.2014

গড়ে তুললে গণ্ডারেরা অচিরেই বিপদের সম্মুখীন হবে। এরপর বাড়ছে সংলগ্ন গ্রাম ও বনবস্তির মানুষ ও গৃহপালিত পশুদের বনভূমির ওপর নির্ভরতা। ফলে, খাদ্যর জন্য গণ্ডারেরা গাউর, হাতি বা গরুদের সাথে লিপ্ত হচ্ছে আন্তঃপ্রজাতি প্রতিযোগিতায়। কুচবিহার জেলার রসমতীতে গণ্ডারের তৃতীয় বাসভূমি গড়ে তোলার প্রস্তাব উঠেছে, কিন্তু অর্থের অভাবে সে প্রকল্পও মুখ থুবড়ে পড়তে চলেছে। চারণভূমির অভাবে গণ্ডারেরা বেরিয়ে আসছে বনাঞ্চল থেকে, ফলে বাড়ছে বিপদের আশঙ্কা।

(৩)

গরুমারা ন্যাশনাল পার্কে ক'দিন কাটিয়ে রওনা দিলাম লাগোয়া জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে। গত ক'দিনে দেখা পেয়েছি বেশ ক'টি গণ্ডারের। জলদাপাড়ায় হলং বন-বাংলোটি একেবারে অরণ্যের মাঝখানে অবস্থিত। বুকিং পাওয়া একটু কঠিন, কারণ চাহিদা স্বভাবতই বেশি। বাংলোর পুরনো দিনের ডুয়ার্স-প্যাটার্নের ঘরে বসে আপনি জানালায় চোখ রাখলেই দেখতে পাবেন হরিণ, গাউর বা গণ্ডারের সল্ট পিটে আসাযাওয়া। জলদাপাড়ায় হাতি-সাফারিও হয় ঠিক হলং বন বাংলোর সামনে থেকে। শেষদিন ভোরবেলা হাতির পিঠে রওনা হলাম জঙ্গলের পথে। হাতির দলের সার বেঁধে 'এলিফেন্ট গ্রাস' সরিয়ে চলার শব্দ সবসময়ই এক অদ্ভুত রোমাঞ্চের জন্ম দেয়। একটু এগিয়ে হলং বাংলোর পাশ দিয়ে বয়ে চলা হলং নদী আবার পড়ল। সেটা পার হবার সময়ই দেখতে পেলাম প্রথম গণ্ডারটির। নদীর শীতল জলে গা ডুবিয়ে সে তখন বিশ্রাম নিচ্ছে। এ অঞ্চলে এই ছোট ছোট ঝোরাগুলি গরমকালে গণ্ডারের দেখা পাওয়ার আদর্শ জায়গা। এরা প্রায়শই গরম থেকে বাঁচতে এগুলোতে গা ডুবিয়ে বিশ্রাম নেয়। যাইহোক, সেখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে আর একটু এগোতেই দেখা মিলল এক জখম পুরুষ গণ্ডারের। গাইডের মুখ থেকে জানলাম কাল সারারাত ধরে এই জখম গণ্ডারটি লড়াই চালিয়েছে তার প্রতিপক্ষ অপর বুল-গণ্ডারটির সাথে। এখন আহত ও পরাজিত গণ্ডারটি পালাচ্ছে তার বিজিত রাজত্ব ছেড়ে। দেখলাম তার পিঠের কাছের ক্ষত তখন টাটকা আর রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে সেখান থেকে। এই পুরুষ গণ্ডারদের মধ্যে লড়াই এ অঞ্চলের এক সমস্যা। শেষ সেন্সাসে উঠে আসা তথ্য অনুযায়ী, জলদাপাড়ায় পুরুষ ও স্ত্রী গণ্ডারের অনুপাত ৩:২ আর গরুমারাতে এই অনুপাত আরও উদ্বেগজনক, ৭:২। অর্থাৎ পুরুষদের তুলনায় স্ত্রী গণ্ডারের সংখ্যা অনেকটাই কম; যেখানে হওয়া উচিত ছিল ঠিক তার উল্টো। ফলে পুরুষ গণ্ডারদের মধ্যে লড়াই বাড়ছে। পাশাপাশি এখানে জমিও অপ্রতুল। ফলে এলাকা দখলের লড়াই দৈনন্দিন ঘটনা। সবচেয়ে উদ্বেগজনক হোল এদের সংখ্যা কম হওয়ায় ও অন্তঃপ্রজনন হওয়ায় জীনের বৈচিত্র্য কমে যাচ্ছে, যা প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই ডুয়ার্সের গণ্ডারদের নিঃশব্দে ঠেলে দিচ্ছে অবলুপ্তির পথে। তাই ডুয়ার্সে গণ্ডারদের বাঁচাতে শিগগিরই পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম বা নেপাল থেকে আরও স্ত্রী গণ্ডার এনে এই অঞ্চলে ছাড়ার উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

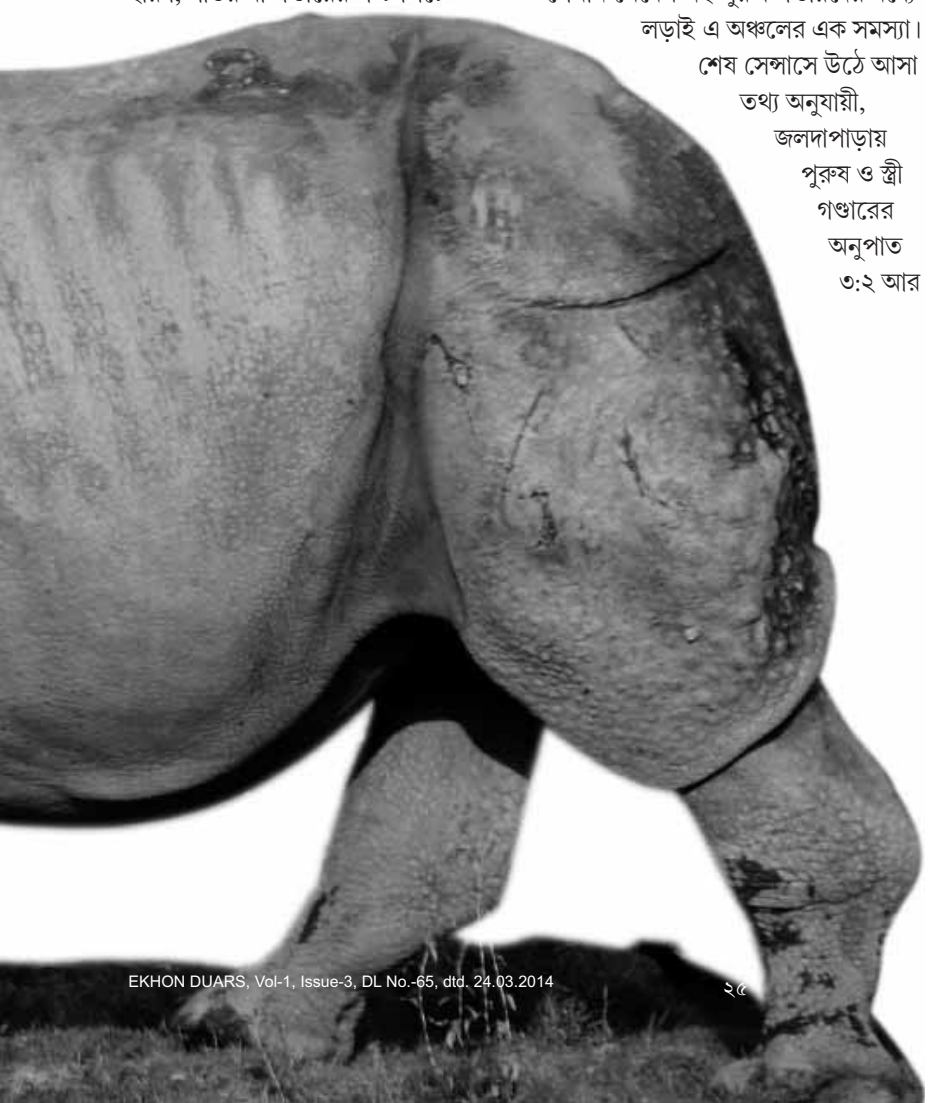

সাফারির ঠিক শেষের দিকে আবার দেখা পেলাম দুটো মা ও শিশু গণ্ডারের। মা আমাদের দেখতে পেয়েই গভীর মমতায় আড়াল করে নিল তার ছোট্ট শিশুটিকে। তারপর দ্রুত সরে যেতে লাগল আমাদের নজরের আড়ালে। মনটা হঠাৎ ভারাক্রান্ত হয়ে এল। আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী। বিপন্ন এই প্রাণীটিকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমরা আমাদের নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছি। তাতে এদের সংখ্যা হয়তো এখন বেড়েছে, কিন্তু এটা ভুলে যাব কী ভাবে যে একদিন এরাই তো রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে ছিল অনেক সংখ্যায়। অতীতে যারা এখানের সব বনাঞ্চলগুলোতে ঘুরে বেড়াত, তাদের বিপন্নতার দোরগোড়ায় এনে দাঁড় করিয়েছে তো আমাদেরই অকারণ প্রমোদ বিলাস! অথচ ক্ষুদ্র এই পরিসরে আবদ্ধ কতিপয় এই প্রাণীদের সংখ্যার সামান্য বৃদ্ধির সম্পূর্ণ কৃতিত্বটুকুও কী নির্লজ্জের মতো আমরা দাবি করি! যে বাসভূমি আজ আমরা ওদের হাতে তুলে দিয়েছি, সেটা ওদের নিজেদেরই নয় কি? আর এ বাসভূমি এই ছোট্ট শিশুটির ভবিষ্যতের জন্য কতটা সুরক্ষিত, এ আশংকাও কি আমরা মন থেকে একেবারে মুছে দিতে পারি?

তাই পার্ক ছেড়ে আসতে আসতে মন থেকে একটা কামনাই করছিলাম, আবার যেদিন আসব সেদিন যেন এই নিরীহ বিপন্ন প্রাণীগুলোর জন্য আবার বুকভরা দুশ্চিন্তা নিয়ে বাড়ি ফিরতে না হয়। ভালো থাকুক গরুমারা-জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্ক, ভালো থাকুক এখানকার গণ্ডারেরা।

শৌভনিক চক্রবর্তী

রংরুটের বই

কেবল ক্যামেরায় নয়, ডায়রির পাতায় ভারত দর্শন। মূল্য ১০০ টাকা

এবারে রয়েছে সাগর সৈকত ধরে পশ্চিমে গুজরাত থেকে কোঙ্কন উপকূল বরাবর মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্ণাটক, কেরালা হয়ে তামিলনাড়ু। মূল্য ৬০ টাকা

উত্তর-পূর্ব ভারতের সাত রাজ্য আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও অরুণাচল বেড়াতে যাওয়ার হালহদিশ। মূল্য ১০০ টাকা।

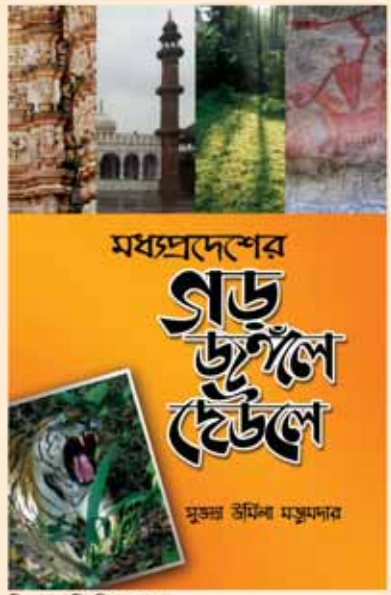

হিন্দুস্থান কি দিল দেখো।
মধ্যপ্রদেশ আবিষ্কারের দীর্ঘ কাহিনী বাংলায় সম্ভবত এই প্রথম। মূল্য ২০০ টাকা।

মূল্য ১০০ টাকা।

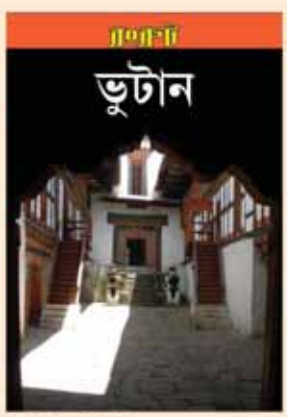

মূল্য ১০০ টাকা।

মূল্য ১০০ টাকা।

মূল্য ১০০ টাকা।

সব্যসাচী চক্রবর্তীর কেনিয়া সাফারির ভিডিও এবার DVDতে

এছাড়াও বেণুদার সঙ্গে আফ্রিকার জঙ্গলে বইটিও পাওয়া যাচ্ছে

মূল্য ৩০০ টাকা।

এ কোনও ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফির গল্প নয়, একাহিনী অরণ্যের দিনরাত্রির। ক্যামেরা বাগিয়ে জঙ্গলে ছোটা মানুষের সংখ্যা আজ কম নয়, কিন্তু জঙ্গলে আস্তানা গেড়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটানোর অভিজ্ঞতা ক'জন শহুরে অরণ্য প্রেমীর আছে? ১২০ টাকা।

শুভেন্দু ঘোষ। গল্প সংকলন। **ফণিমনসা**। ১২০ টাকা

দীপিকা ভট্টাচার্য। **হালফিল বর্মা মুলুকে**। ৬০ টাকা

অমিত কুমার দে। কাব্যগ্রন্থ। **ডুয়ার্সের কাব্য** । ৬০ টাকা

বাড়িতে বসে বই পেতে হলে মেল করুন
rongroute@rediffmail.com

প্রাপ্তিস্থান

এই অবকাশে ১৮/৭ ডোভার লেন, কলকাতা ২৯, ফোন ৬৫৩৬০৪৬৩, ৯৮৩০৪৪০৮০৮

অক্সফোর্ড ১৫ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ১৬ ফোন ০৩৩-৩২৬২৪৬৮৫

মিনি বুক স্টল ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, ফোন ৯৮৩০৭ ৫৪৪৫৬

দে'জ পাবলিশিং হাউস ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, ফোন ২২৪১ ২৩৩০

বালিকাবেলার যে ডুয়ার্স আমার চেনা

ফেলে আসা জীবনের কথা কেউ যদি লিখতে বলে তা কি নিখুঁত হবে? সেটা যদি হয় আবার জীবনের তিনভাগ পেরিয়ে এসে? বিস্মৃত ঘটনাসমূহ মনে করিয়ে দেবার মতো কেউ তো আর ইহজগতে নেই। পাহাড়ি জীবনযাত্রা তখন যেমন দেখেছি, এখন তো মিলে মিশে একাকার। ফেলে আসা সময়ের পাতা উল্টে প্রথম ভাগে যাই সে আমার জন্মের পর, সামসিং চা-বাগানের দিনগুলোতে। মনে মনেই ফিরি, চেষ্টা করে দেখি, আমার স্নেহভাজন অমিতের আশা কতটা পূরণ করতে পারি।

আমার ছোটবেলা কেটেছে সামসিং পাহাড়ের কোলে প্রকৃতির এক অংশ হয়ে — যেমন ঝোপ-ঝাড়-বনের নীল হলুদ বেগুনী ফুল; নানারঙের ছোট-বড় প্রজাপতি, পাখি-ঝর্না-ঝোরা-নদী-বন-পাহাড়-মেঘ-কুয়াশা-চাবাগান-কমলা বাগান। এই ছোটদের দলে মাইলী, সাইলী, মায়া, কাঞ্ছী, নছমন, মাইলা, কালে, সায়লা ও আমরা বাবুদের ছেলেমেয়েরা। তফাত ছিল না। ছিল বড়দের মধ্যে গন্ডিকাটা - এক গন্ডিতে ছিল সাহেব মেম বস বেয়ারা বাবুর্চি মালি আয়া কুকুর ঘোড়া ড্রাইভার। দূরত্ব রেখে ফুল-ফল-সবজিতে ঘেরা লাল টিনের চাল ও সবুজ কাঠের বাংলো। আর এক গন্ডিতে বাবুদের পরিবার নেপালি কাজের লোক মালী রাখাল। সে সকালে গোয়াল থেকে গরু নিয়ে চড়াতে যেত, বিকেলে ফিরে আসত। গোয়ালাও দুধ নিয়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকে পাত্রে দুধ ঢেলে চলে যেত সামনে কেউ থাকত না। বাবুদেরও ফুল-ফল-সবজিতে ঘেরা লাল টিনের চাল ও সবুজ কাঠের বাংলো। এই গন্ডিতে ডাক্তার, কম্পাউন্ডার, মাস্টার ও সুপারিন্টেডেন্ট অফিসের বাবুরা। সবার বাড়ি প্রায় একরকম ও কাজের লোকরাও। একই রকম নিয়মে চলত। বেশ দূরত্ব রেখে। একটা প্রচুর ফুলে ঘেরা

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হলে নারীরা অনেকেই সংসার, স্বামী, ছেলেমেয়ে ছেড়ে অন্য কোন প্রিয় জনের সঙ্গে গিয়ে নতুন সংসার পেতে ফেলত। ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রেম হলে বিয়েতে অভিভাবকের যদি মত না থাকে বাড়ি থেকে পালিয়ে দুজনে অন্য কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধে। আর অভিভাবকের পছন্দ মতো বিয়ে হলে উৎসব শুরু হয়ে যায়

হাসপাতাল। তার পাশের ঝোরাটা, তাকে আলাদা করে রেখেছে। বড় রাস্তা থেকে একটু চড়াই বেয়ে উঠতে হয়। আমরা মাঝে মাঝেই সেখানে হানা দিতাম, কাজিমলদাজুর কাছে। আবদার করতাম আমাদেরও অসুধ দাও। দাজু আমাদের সবাইকে লাল লাল সিরাপ এক চামচ করে করে সবার হা-করা মুখে খাইয়ে দিত। বস্তির বন্ধুরা আমাদের সাথে আসত না, ওদের ভয় করত — বলত সুই দিয়ে দেবে। আর এক গন্ডিতে চা-বাগানের কুলি, অফিসের কাজের লোক, পাহাড়ি পারিবারের অন্যান্যরা ও বাবুদের বাড়ির কাজের লোক। এরা ভোরে উঠেই মেয়ে-পুরুষরা তারে সংসারের কাজ সেরে যে যার কর্মস্থলে চলে যেত। কোন নেপালী নারী বাবুদের বাড়িতে কাজ করত; তারা সংসারের কাজ সেরে ছোট বাচ্চা থাকলে কাপড়ের ঝোলায় পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে যেত চা-বাগানে। নিরাপদে কোন গাছের ডালে ঝুলিয়ে কাছাকাছি রেখে পাতি তুলত। যারা কাজে যেত না তাদের হাজার কাজ - একটু বড় বাচ্চার দেখাশোনা, ছাগল-গরু চড়ানো, জ্বালানি কাঠ জোগাড়। ঘাস কেটে পিঠে বোঝা নিয়ে উঁচু চড়াই থেকে নেমে আসত মেয়েরা। কুলিলাইনের গন্ডির বাইরে পাহাড়ের ওপর দিকের বস্তিতে অন্যের খেতেও কাজ করত। সেখানে কমলা বাগানে মাঝে মাঝে আমরা যেতাম। বস্তির লোকেরা খুশি হয়ে হাতে ও কোটের পকেটে এতো কমলা দিত যা আনাই মুশকিল হয়ে যেত, ঢাল বেয়ে নামার সময় অনেকে নামার সময় অনেকে পড়েও যেত। বাবুদের ছেলেমেয়েরা তাদের বস্তিতে এসেছে বলে সাড়া পড়ে যেত বস্তিতে। উপরের বস্তিতে বা আমাদের কুলিলাইনের বাড়িতে ঘরে কোনদিন তালা দিতে দেখিনি। খালি বাড়ি দরজা ভেজিয়েই চলে যেত দূরে দূরে কোথায়! বড় রাস্তা দিয়ে না গিয়ে রাস্তা সংক্ষেপ করার জন্য পাহাড়ে ওপর দিকে যাবার সময় কুলি লাইনের সরু সরু রাস্তা দিয়ে যেতাম, তবে ওদের বাড়িতে আমরা কোনদিনই ঢুকিনি। যেতে যেতেই দেখতাম কেউ বাসন মাজছে, কেউ পাথরের ওপরে কাপড়-চোপড় কাচছে কাঠের মুগুর দিয়ে। এদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। বন-জঙ্গল-ঝোপঝাড়ে কত কী বুনো ফল পাওয়া যেত। ওরা চিনত সব। আমরাও ওদের সঙ্গে গাছের নিচে বসে বসে খেতাম সেইসব বুনো ফল। ওরা স্নান করেনা বা জামাকাপড়ও নোংরা এসব কিছুই মনে হত না। চা-বাগানের সরু সরু গলিতে খেলা। মূর্তি নদীতে পাথর থেকে পাথরে লাফ দিয়ে নদী পার হওয়ার প্রতিযোগিতা পর্যন্তই। আমরা ওদের বাড়িতে বা ওরাও আমাদের বাড়িতে কোনদিন আসা-যাওয়া করিনি। বড়রা কোনদিন তো নিষেধও করেনি। আমাদের ছোটবেলা ছিল — কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা! আমরা যেমন দল বেঁধে টইটই-এ বের হতাম, কিন্তু ওদের কাজ থাকত — গরু-ছাগল চরানো তাদের মায়ের সাথে ঘাস ও জ্বালানি কাঠ জোগাড়ে যেত। চলার

পথে দেখা হলেই নানান কথা — বিপদে পড়লেও ওরাই উদ্ধার করত। যেমন সবাইকে হারিয়ে দেব বলে চোরাবাটো দিয়ে নামছি; হঠাৎ ঝোপ ও বড় বড় পাথরের মাঝে আটকে গেলাম, কিছুতেই বের হতে পারছি না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, বাঘের ভয়ে উঁচু এক বড় পাথরের মাথায় বসে আছি। গরু খুঁজতে এসে এক পাহাড়ি বন্ধু উদ্ধার করল। বলল - আগে জামাকাপড় খুলে ভাল করে ঝেড়ে নে। ওরা খুব ভূতে বিশ্বাস করত, কুলি লাইনের বাইরের রাস্তায় রাতে ভূতের পুজো করত পাহাড়িরা। আমাদের বাংলো থেকে কাঁচের জানালা দিয়ে দেখেছি — তাই আমিও ছোট থেকেই ভূতে বিশ্বাস করি। আরো একবার এক বন্ধুর কথা ভোলার নয়। আমার স্বভাবমতো মূর্তি নদী পার হচ্ছি দল ছেড়ে পাথর থেকে পাথরে লাফ দিয়ে। এক শ্যাওলা ধরা পাথরে পা পড়তেই সরাৎ করে এক বিশাল পাথরের নিচে এক গলা জলে। আমার এই বন্ধু গরুকে জল খাওয়ানোর জন্য পাহাড় থেকে নামার সময় আমাকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে। আমার এই বন্ধুরা ওদের গন্ডির মধ্যে পাহাড়ে জঙ্গলেই বেশি ঘুরে বেড়াত ও গুলতি দিয়ে পাখি মারতে ও ধরতেই বেশি পছন্দ করত। যা আমাদের মোটেই ভাল লাগত না। এখানের লোকেরা খুব দারু (মদ) খেত; নারী-পুরুষ সবাই। কুলি লাইনে মাঝে মধ্যেই খুব হল্লা, মারামারি হয়। স্বামী-স্ত্রীতে। মেয়েরা এক তরফা মার খায় না, স্বামীকে সেও ভাল মতো উত্তম-মধ্যম দিয়ে দিত। সাধারণতঃ পুরুষদের থেকে মেয়েরাই বেশি পরিশ্রম করে দেখেছি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হলে নারীরা অনেকেই সংসার, স্বামী, ছেলেমেয়ে ছেড়ে অন্য কোন প্রিয় জনের সঙ্গে গিয়ে নতুন সংসার পেতে ফেলত। ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রেম হলে বিয়েতে অভিভাবকের যদি মত না থাকে বাড়ি থেকে পালিয়ে দুজনে অন্য কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধে। আর অভিভাবকের পছন্দ মতো বিয়ে হলে উৎসব শুরু হয়ে যায়, আত্মীয়স্বজন পাড়া প্রতিবেশী সবাইকে সঙ্গে নিয়ে। পুরোহিত দিয়ে বিয়ে হয় নিয়ম মতোই, সানাই, ঢোল, সানাইয়ের মতো বিশাল লম্বা এক বাদ্যযন্ত্র নিয়ে — বরযাত্রীও আসে, যার যেমন ক্ষমতা। পণের প্রচলন ছিল না। ভোজে থাকত ঢালাও মদ, শুয়োরের মাংস ভাত। বরযাত্রী, বর, কনের ডুলির আগে-পিছে বাজনা নিয়ে কনের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা পাহাড় থেকে পাহাড়ে। আর একটাও এই যাত্রা যেন দেখেছিলাম আবছা আবছা মনে আছে — একটা লম্বা কাঠের বা বাঁশের দন্ড, দুই প্রান্তে কাপড় বেঁধে দোলার মতো করে কনেকে বসিয়ে কাঁধে নিয়ে কনের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা। সে সময় রাস্তাঘাটের তেমন সুবিধা ছিল না। যেটুকু ছিল পাথর বিছানো। তাও সরু সরু। কেউ মারা গেলে কাঁধে করে শঙ্খ বাজিয়ে শ্মশানযাত্রা, সেখানে দাহ করে সাদা কাপড়ের নিশান লাগাত। ছোটবেলায় শঙ্খের আওয়াজে ভয় পেতাম। ওদের উৎসব দূর থেকেই দেখা, আমাদের গন্ডি থেকে। তবে ওদের মুখে সুখ-দুঃখের কথা শুনলে যেমন আনন্দ পেয়েছি, তেমন দুঃখিতও হয়েছি। বাবুরাও সাহায্য করেছে। ভাল কাজে বকশিস দিতে দেখেছি। সাহেবরাও বকশিস দিত। সাধারণতঃ পাহাড়বাসীরা গরীব ছিল, কিন্তু কারো কাছে কিছু চাইত না, ভিক্ষাও করতে দেখিনি। এরা খুব সৎ, ভদ্র ও বিনয়ী। লামা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাই কেবল বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভিক্ষা করত, তখন অস্ফুট স্বরে কী যেন মন্ত্র পড়ত। ওদের পোশাক-পরিচ্ছদও অন্যরকম ছিল। এখানকার লোকের মতো নয়। এই নেপালী নারীরা স্বাবলম্বী ছিল। তাদের স্বামীরা তাদের ওপর স্বামীত্ব ফলাতে পারেনি কোনদিন। ওরা খুব হাসিখুশি — ঝোরায় কাপড় কাচা স্নানের সময়ও দল বেঁধে চলতে চলতে গান, নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে হেসে একজন অর এক জনের গায়ে ঢলে পড়ত। বস্তি ঘরের বারান্দায় ঝোলান বস্তার দোলনায় বাচ্চাকে শোনানো বুড়ি আম্মার ঘুমপাড়ানি গান 'লহই লহই লাথার কে...' পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে কী যে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করত। এখনও ভাবলে মন ফিরে যেতে চায় আমার সেই ছোট্টবেলার দিনগুলিতে। রবিবার করে বস্তির নারীরা পিঠে ঝোলানো বেতের টুকরিতে মাখন, কোয়াশ, কমলা নিয়ে মেটেলী হাটে যেত। বাবুদের বাড়িতে কাজ করেনি কিন্তু নিয়মিত মাখন ও দুধ জোগান দিত মেয়েরা। ঝোরায় মেয়েরা স্নান করত। সেখানে পুরুষরাও কাপড় কাচত স্নান করত। ওদের

স্নানের সময় দেখেছি লজ্জা শরমের বালাই ছিল না। তাদের কাছে এটাই স্বাভাবিক ছিল। রাস্তার ধারে কুলিলাইনেও বস্তির লোকরা জুয়া খেলত মদ খেত। কোন লুকোছাপা ছিল না। আমাদের বাড়ির কাজের লোকরা কোনদিনই মদ খেয়ে আসেনি। এই পাহাড়বাসীদের ফুটবল খেলা, মুরগীর লড়াই খুব পছন্দের ছিল।

ছোটরা ওদের লাইনের গলির মধ্যে ডাংগুলি খেলত। স্কুলেও কম যেত এরা। পাহাড়ের ওপর দিকে রেঞ্জার অফিস, এক মাইল নিচে সামসিং। সেখানে চায়ের গুদাম ও কারখানা। ওইসব জায়গাও আমাদর অনেক বন্ধু ছিল। সেখানে মাঝেমাঝেই খেলতে যেতাম আমরা। ওদের ডাকলেও যেত না ওরা। আমাদের মতো ওদের অত সময় ছিল না হয়তো। পাহাড়ের বস্তির ওপর দিকে আর এক সমাজ ছিল, তারা চা-বাগানে কাজ করত না। তাদের বাড়ি ছিল অন্যরকম। নিচের দিকটা মাটি ও পাথরের, ওপরের দিকে রেলিং ঘেরা বারান্দা। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠেই ঘরটাও কাঠের। বারান্দার ওপর দিকে বড় বড় ঠাকুর-দেবতার ও পরিবারের লোকেরা ফটো ও হরিণ বাইসন-এর শিং দিয়ে সাজানো বসার জায়গা। বড় বড় ঘর সাজানো গোছানো। অনেকটা বাংলা টাইপের টিনের চাল দেওয়া। নিচের দিকে ভাল করে ঘেরা দেওয়া। সেখানে গরু ছাগল হাঁস মুরগী — চিতাবাঘের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই এই ব্যবস্থা। এদের বাবুদের সঙ্গে ওঠা-বসা ছিল। এক পরিবার ছিল, তাদের সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। তার নাম ছিল অম্বরে রানা। আমরা দাজু বলে ডাকতাম। তার দাদুকে ডাকতাম বাজে বলে। ওপরের দিকের বস্তিতে একটা দোকান ছিল, সবাই বলত কাঁইয়ার দোকান। আমরাও তাই বলতাম। পরে জেনেছিলাম এরা মাড়োয়ারি। একটা স্কুলও ছিল বড় রাস্তার ধারে খেলার মাঠের ওপর দিকে; এক পাশে আমরা বাংলা ও ইংরেজি পড়তাম আর এক পাশে বস্তির ছেলেমেয়েরা পড়ত হিন্দি ইংরেজি। এখানের পড়া শেষ হলে ওরা দার্জিলিং বা কার্শিয়াং চলে যেত। যারা গরীব তাদের আর পড়া হত না, একটু বড় হয়ে বাবা-মা-র সঙ্গে বা এখানকার সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফিস বা নিচে সামসিং চায়ের গুদাম বা কারখানায় কাজ করত। অম্বরে দাজুও লেখাপড়া জানত। এই রানা পরিবারের মতো কমলা বাগানের ওপর দিকেও ওইরকম বাংলো টাইপের বাড়িঘর নিয়ে আরো পরিবার বাস করত। হাসপাতালে বা অফিসে যারা কাজ করত তাদেরও বাড়ি এই বস্তিতে বা কুলিলাইনের গন্ডিতে ছিল। পুজো-পার্বনও করত — নারায়ণ পুজো। দুর্গাপুজোর আগের দিন রামচন্দ্রের বনবাস থেকে রাজ্যে ফেরাকে স্মরণ করে আগে নারীরা ও পরের দিন ছেলেরা দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে পথ পরিক্রমা করত। ধনী দরিদ্র সবাই থাকত এই উৎসবে। দেওয়ালির দিন সারা পাহাড় আলোয় সেজে উঠত, প্রায় সবার বাড়িতেই দেওয়া হত আকাশপ্রদীপ। ভাইফোঁটার দিন ভাইয়ের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দই দুধ খাওয়াত বোনেরা। সেদিন ঢেউসিরে গান করে বাড়ি বাড়ি ঘুরত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা; অল্প অল্প মনে আছে গানগুলো - 'বাবুকো ঘরমা ঢেউসিরে, চার আনাপইসা ঢেউসিরে, দিনুপরছা ঢেউসিরে।' অনেকদিন আগের কথা, সুরগুলো কিন্তু কানে বেজে আছে এখনো। লক্ষ্মী পুজোর দিন আগে মেয়েরা ও পরের দিন ছেলেরা 'ভাইলিসী' উৎসব পালন করত গান করে করে পথ পরিক্রমায়। সব পুজো-পার্বণে উৎসবে সিয়েল বা সেল রুটি বানাত; সেটা দেখতে মোটা সোটা, গোল বড় নরম মিষ্টি জিলিপির মতো ভাজা। আর কোন মিষ্টি বা সন্দেশ কোন উৎসবে দেখিনি।

সেই সময় চা-বাগানে সাহেবদের কুঠি, বাবুদের বাংলো ও তাদের চলাচলের জন্য সুন্দর রাস্তা ছাড়া পাহাড়বাসীদের জন্য কোন সুযোগ-সুবিধে ছিল না। একটা হাসপাতাল ছিল সেখানে চা-বাগানের কুলিদের ও বস্তির লোকেদের চিকিৎসা হত। বস্তিবাসীরা বেশির ভাগ তাদের ঘরোয়া পদ্ধতি বা ওঝা, ঝাড়ফুঁক এসবেই বিশ্বাসী ছিল। সব হিন্দুদের মতো এদের মধ্যেও জাতিভেদ প্রথা ছিল - উঁচু জাত নিচু জাত সবার হাতে জল খেত না সবাই, ঘরেও ঢুকতে দিত না। সেটা আমাদের বাড়িতে দেখেছিলাম।

ওদের নিজস্ব পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল, আমি যেমন দেখেছিলাম সেগুলোই লিখছি। তবে নামগুলো জানা ছিল না। আমার এক ভোরের ভ্রমণসঙ্গী, নাম তার করন থাপা, তার কাছে জেনে লিখছি - মহিলাদের পোশাক চৌবন্দি চৌলা, গুনিউ, কোমরে পটুকা গায়ে ওড়না বা শাল। গয়না - কানে নাকে ডোংরি মুন্দি। গলায় কণ্ঠ, মঙ্গলসূত্র (বিবাহিতদের)। হাতে চুড়া। পায়ে বোলিচাঁদি। ছেলেদের পোশাক - দৌড়া শুরাল, কামি, সার্ট, কোট, টুপি, জুতা, কোমরে কুকরি। খাদ্য ছিল ভুট্টা, রুটি, মাংস, মাছ, ভাত। উৎসবে শুয়োরের মাংস, তবে শূকর কেউ পালত না; মদ খুবই খেত তবে মাতাল কমই দেখেছি রাস্তাঘাটে। এতে ওদের গোপনীয়তা ছিল না - অতিথি গেলেও এটাই দেওয়ার রেওয়াজ। নারী-পুরুষ সবাই ধুমপান করত ও মদ খেত। শীতপ্রধান জায়গা, প্রায় সবাই উল বুনত, বৃদ্ধরাও। নিজেদের জন্য।

বাবার রিটায়ারের পর বাড়িতে এসে দেখলাম এখানেও দুটো গন্ডি - ভেতর বাড়ি আর বারবাড়ি। এসেই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। স্কুলে যাওয়া আসার সময়ই বারবাড়ি দিয়ে যাতায়াত করা যেত। টইটই তো মোটেই নয়। মেখলিগঞ্জের নন্দীবাড়ির আইন ছিল খুব কড়া। এই বাড়ির কর্ত্রী ছিলেন আমার ঠাকুমা বরদাসুন্দরী; তাঁর কথাই শেষ কথা। বারবাড়ির কাজের লোকরা খাওয়ার সময় ভেতরবাড়িতে আসতে পারত ও উঠোনে বসেই ভাত খেত। ভেতর বাড়ির কাজের লোকেরা রান্নাঘরের বারান্দায় বসে খেত। চা-বাগানের সাহেবরা সেখানে বাবুদের বাড়িতে কোনদিনও আসেনি। কিন্তু আমাদের বাড়িতে আসত বারবাড়ি পর্যন্তই। এই বাড়ির ছেলেরা সবাই শিকার ও ফুটবল খেলায় ওস্তাদ। সেই সূত্রেই সাহেবদের সঙ্গে খাতির ছিল। ভেতর বাড়িতে যে কাজের মহিলা ছিল, সে যে কাপড় পরত তাকে বলত ফোতা, বুকে বাঁধত মোটা রঙিন ডোরাকাটা কাপড়। সবসময় তার পানের নেশা - মজাগুয়া দিয়ে খেত, খুব বিশ্রী গন্ধ। সঙ্গের বটুয়াতে থাকত পানগুয়া, একটা কাটারি, গামছা। দাদা-কাকাদের সাথে আমাদের জোতে গিয়েও দেখেছিলাম সব বয়সের এ দেশীয় নারীরাই ফোতা পরিধান করত। রূপোর গয়না, গায়ে গামছা বাচ্চাদের। এই গামছা, ফোতা তারা নিজেরাই বুনত। পুরুষরাও তাদের বাড়িতে বা কাজে-কর্মে বেশির ভাগ সময়ে গামছাই পরত। বাইরে গেলে ধুতি, পাঞ্জাবি বা সার্ট, সাথে একটা গামছা। মজাগুয়া-পান এদের নেশা, সঙ্গে বিড়ি। হুঁকো। আমি তো বৃদ্ধাদেরও হুঁকো খেতে দেখেছি। অতিথি গেলে একটা রেকাবিতে আলাদা আলাদা করে পান, চুন, মজাগুয়া বা কাঁচা সুপুরি দেওয়ার রেওয়াজ। এদের প্রিয় খাদ্য শুটকি মাছ। এই মাছের নানান পদ দিয়ে ভাতই খেত। সে সময় এরা রুটি খেতে পছন্দ করত না।

কবিতা পাল

(লেখিকার জন্ম ১৯৩৭-এর ৩০ আগস্ট। বালিকাবেলা কেটেছে পাহাড়ের কোলে সামসিং চা-বাগানে)

ছোটগল্প

তনুশ্রী পাল

বন টিয়েটির মন

গাড়িটা লাটাগুড়ি বাজার পেরিয়ে খানিক এগোতেই আমি বলি, 'জানালার কাচ একটু নামিয়ে দে অনিন্দ্য। অরণ্যের নির্মল পরিষেবা এই অক্সিজেন ভর্তি বিশুদ্ধ বাতাস টেনে নে ফুসফুস ভরে, আর কোথাও পাবি না ও জিনিস। অজয়দা গাড়িটা একদম আস্তে আস্তে চালিয়ে যান, বনের বাতাস পান করতে করতে যাই। আর কখন কি বিরল দৃশ্য দেখতে পাবো।'

অজয়দা মনে হয় কুড়িতে নামিয়ে আনে স্পীড্ মিটারের কাঁটা। চওড়া কালো সিঁথির মতো এই পীচ রাস্তাটার দু'ধারে গরুমারা জঙ্গলের বিস্তার। প্রচুর বন্যপ্রাণীও আছে; আমি আর বাপ্পা কতবার বনবিভাগের চমৎকার বনবাংলোয় এসে থেকে গেছি। মূর্তির ধারের গাছবাড়িতে থেকেছি। হাতির পিঠে জঙ্গল সাফারি করেছি। ময়ূর, বাইসন, বাচ্চা সহ গন্ডার মা, কতরকমের পাখির ডাক, পাখি, কত চমৎকার সব মুহূর্ত কাটিয়েছি। অনিন্দ্যর কথায় আমার ঘোর কাটে।

'ওহ্ তাই, নির্মল পরিষেবা, চমৎকার বললি তো। সত্যি খুব অন্যরকম ভাল লাগছে। এরকম একটা জঙ্গল সাফারি জুটবে কপালে, আজ ভোরেও বিন্দুমাত্র আঁচ করিনি রে। থ্যাঙ্ক য়ু রিমি।'

'এই গরুমারার জঙ্গল গাছেদের রাজ্যপাট, ওদেরই আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধব, ওদেরই গাল-গল্প, গান-আড্ডা। শুনতে চাইলে, বুঝতে চাইলে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে চাইলে চুপ করে থাকতে হবে। ওদের ভাষা আয়ত্ত করতে হবে, বুঝেছো হে।'

'তাই নাকি? বেশ বলিস তুই।'

'সরল, সহজ, হাসিখুশি, আনন্দিত , খোলামনের মানুষেরাই শুধু অপরূপ এই অরণ্যের আড্ডায় ডাক পায়, স্থান পায় জানিস। তারাই শুধু ওদের ভাষা বুঝতে পারে।'

'ওরা নিজেদের ভাষায় কথা বলছে, মাথা দোলাচ্ছে; ঠিক ঠিক আর আমরা ট্রেসপাসার। তাই না?'

হ্যাঁ, ওরা সবাই সবার বন্ধু, না আত্মীয়! কেউ কারও ঘাড়ে পড়েনি, সবাই মাথা তুলছে আকাশের দিকে, রোদ্দুরের দিকে; বাপ্পা এই রকম ভাবত। আর একরকম করেই বলত জানিস।'

'আচ্ছা; এই আমি যে তোকে খুঁজে বের করলাম, তোর ব্যাঙ্কে গিয়ে হাজির হলাম। অবাক হোসনি তুই।'

'না, বন্ধুরা অনেকেই তো জানে আমি এখানে আছি।'

'তোকে কিন্তু আমি খুঁজেটুজে বের করেছি, মেয়ে এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হল। তোর কথাটা মাথায় ছিল, ব্যাঙ্কে আছিস জানা ছিল;বাপ্পাকে বিয়ে করেছিস তাও জানতাম। কী বল তো, আমরা বন্ধুরা সবাই সবার খবর মোটামুটি রাখি। মেয়েরাই বিয়ে-টিয়ে করে কেমন হারিয়ে যায়। তুই কিন্তু স্পেশাল ছিলি; তোর কথা আমরা এখনও বলি। ইউনিভার্সিটিতে কতো ইট পাতা ছিল তোর জন্যে জানিস তো।'

'তাই বুঝি। আচ্ছা সেই স্মৃতি তাড়িত হয়ে ব্যাঙ্কে এলি সকালে?'

'না, না শোন না। মেয়ে জলপাইগুড়ির কলেজে চান্স পেল, তখন তোর কথাটাও মনে এল। তোর সাথে দেখা করার ইচ্ছে ছিলই। কিন্তু কথা বলবি কি না, ডাকলে আসবি কি না বুঝতে পারছিলাম না। তবে বাপ্পার ব্যাপারটা খুব স্যাড, খুব খারাপ লেগেছে বিশ্বাস কর। এই যে তুই চলে এলি আমার সাথে, কী যে খুশি হয়েছি বলে বোঝাতে পারছি না।'

'মেয়েকে মেসে রাখলি, তোদের তো মাঝে মাঝেই আসতে হবে প্রথম দিকের অন্তত কয়েকটা মাস। তোর বৌ স্কুলে আছেন তো?'

'আসতে তো হবেই। আমাকেই বেশি করে আসতে হবে; ও তো স্কুল আর ইউনিট টেস্টের খাতা দেখেই কুপোকাৎ। উঁ আর একটা কথা অবশ্য আছে এর মধ্যে, বলবো? রাগ করিস না, তোর তো ফোঁস ফোঁস করা স্বভাব ছিল ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়। আমরা ভয় পেতাম তোকে আর হিংসা করতাম বাপ্পাকে।'

'বাপ্পা তো আমার একেবারে ছেলেবেলার বন্ধু না; একেবারে ছোট থেকে একসাথে পড়াশুনো করেছি, এক স্যারের কাছে টিউশন নিয়েছি।'

'শোন তুই যে আজ চলে আসবি আমার সাথে এককথায়, এটা সত্যি আশাতীত। কী বলবো তোকে, এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না। তোর জন্যেই আসব। মেয়েকেও দেখে যাবো, তোর সাথেও দেখা হবে। দারুণ এক্সাইটিং....'

'বাব্বা, তুই দেখছি অনেক কিছু ভেবে ফেলেছিস। বেশ নাটকীয় সংলাপ বলছিস কিন্তু, তুই বাইরে গিয়ে চা খাবার কথা বলতে জঙ্গলে আসার কথা আমিই তো বললাম। অজয়দাকেও পেয়ে গেলাম। বাপ্পা থাকতেই অজয়দার গাড়ি নিয়ে আমরা কতো জায়গায় বেড়িয়েছি। এখনও ওনার গাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে আসি জঙ্গলে, সঙ্গী না পেলে একাও আসি তো।'

'তবুও আমার কাছে একটা অভাবিত সৌভাগ্যলাভ।'

'কী যে বলিস অনিন্দ্য, তোদের সাথে তো সেই ইউনিভার্সিটি মানে ধর পঁচিশ বছরের সম্পর্ক; নাকি তারও দু-এক বছর

চওড়া কালো সিঁথির মতো এই পীচ রাস্তাটার দু'ধারে গরুমারা জঙ্গলের বিস্তার। প্রচুর বন্যপ্রাণীও আছে; আমি আর বাপ্পা কতবার বনবিভাগের চমৎকার বনবাংলোয় এসে থেকে গেছি। মূর্তির ধারের গাছবাড়িতে থেকেছি। হাতির পিঠে জঙ্গল সাফারি করেছি। ময়ূর, বাইসন, বাচ্চা সহ গন্ডার মা, কতরকমের পাখির ডাক, পাখি, কত চমৎকার সব মুহূর্ত কাটিয়েছি।

সে আগুন জ্বলছে, মাংসগুলো আধপোড়া মতো। আমরা তিস্তার চরের মধ্যে বালুর ওপর শুয়ে শুয়ে গল্প করছি, হাসছি। মনে হচ্ছিল পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটায় কি সুখ, এভাবেই যদি দিনরাতগুলো চলে যায়।

বেশিই হবে। অপরিচিত হলে আসতাম নাকি? বেশ তো গাছপালা নিয়ে বলছিলি, এখন আবার কী হল? আজ শনিবার, কাজও সব তুলে ফেলেছি; তুই চায়ের কথা বলতে জঙ্গলের কথাই মনে এল। অজয়দাকেও পেয়ে এলাম তাই চলে এলাম। জঙ্গল আমার ভীষণ প্রিয়। এখন কী আমরা টিন এজে আছি নাকি? প্রায় পঞ্চাশের দোরগোড়ায়। তবে তুই এখনও অনেক ছেলেমানুষ আছিস মনে মনে।'

'একা একাই, শুধু ড্রাইভারের সঙ্গে জঙ্গলে যাস? দারুন সাহস তো।'

'সাহসের কী আছে? অজয়দা আমাদের আত্মীয়র মতোই। বাপ্পা ওনাকে খুব ভালবাসতো, শ্রদ্ধা করত। বাপ্পার সময় উনি শ্মশানেও গিয়েছিলেন। একা একা যাওয়ার কথা বলছিস, ওটা কোনও ব্যাপার না; এই তো ক'দিন আগে দুজন কলিগের সাথে রাজাভাতখাওয়ার কাছেই দমনপুরে একটা রিসর্টে থেকে এলাম। আলিপুরদুয়ার থেকে ন-দশ কিলোমিটার হবে। বন-পাহাড়-নদী এসব আমার ওষুধ বুঝলি।'

'মানুষেরা নয়? তোর বয়স কিন্তু বোঝাই যায় না। চেহারাটা দারুণ রেখেছিস কিন্তু। তো তোর ভ্রমণসঙ্গী, ওই রিসর্টের বেড়ানো... সব নারী না পুরুষ?'

হাঃ হাঃ হাঃ অনিন্দ্য, নারীই ছিল। পুরুষ-টুরুষ কিছু ম্যাটার করে না আমার কাছে। অরণ্যের কাছে যাচ্ছি সেটাই বিষয়, ব্যস।

সে তুই যাই বল, পুরুষদের করবে, তুই এখনও যথেষ্ট সুন্দরী। রাগ করলি না তো, মনে এল তাই বললাম। বানিয়ে বলিনি কিছু। কী নির্জন না জায়গাটা, ঝিঁ ঝিঁ পোকার কনসার্ট বাজছে, কানে তালা লাগিয়ে দেবে তো! সত্যি, আমি ফ্যামিলি নিয়ে অনেক বেড়িয়েছি, কিন্তু এমন অদ্ভুত নির্জনতা, গাছেদের আত্মীয়তা, ঝিঁ ঝিঁ পোকার চিৎকার এসব এরকম করে ফিল করিনি কোনও দিন। কী ডাকলো রে ওটা, শুনলি... হ্যাঁ, শুনতে পেলি, ময়ূর না? দেখতে কী সুন্দর; কিন্তু ডাকটা কেমন যেন। গা-টা শিরশির করে...।

ওটা ঝিঁ ঝিঁ পোকা নয়, ওটাকে শালতোড়া বলে। ময়ূর নয় বনের ভেতর বার্কিং ডিয়ার ডাকছে।

ও আচ্ছা আচ্ছা, তুই অনেক কিছু জানিস। এই রাস্তাটা কোথায় গেছে রে। আর কি এগোবি?

আমরা এখন চাপড়ামারি জঙ্গলের ভেতরে; এই রাস্তাটা ঝালং পাহাড় হয়ে বিন্দুর দিকে গেছে। চল আর একটু এগোই, আস্তে আস্তে রাস্তাটা কেমন উঁচু হয়ে গেছে বুঝতে পারছিস। আবছা নীলচে নীলচে পাহাড় সারি দেখাও যাচ্ছে। খুব বেশি দূর নয় কিন্তু যাবি? আমরা তো চলে যেতাম জানিস; প্রত্যেক উইক এন্ডে, কোথাও না কোথাও। ডুয়ার্সের বা সিকিমের খুব কম জায়গাই আছে যেখানে আমরা যাইনি বা থাকিনি জানিস। তোর তো 'পদাতিক', রাত নটায় না এনজিপি থেকে? মাঝরাতে পৌঁছোবে তোর মালদায়; তোর বউ প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে থাকবে দোরগোড়ায় তাই না, হাঃ হাঃ।

ধুর, প্রদীপ জ্বালিয়ে...। খুব একা হয়ে গেছিস তাই না? কিছু মনে করিস না বাচ্চা-টাচ্চা থাকলে মনে হয় একটু অন্যরকম হ'ত তোর লাইফটা। তোরা ডাক্তার-টাক্তার... মানে হেল্প...।

ব্যাপারটা তা নয়, আমরা ইচ্ছে করেই বাচ্চা নিইনি। আমাদের জীবন ভাবনাটা একটু অন্যরকম ছিল। হঠাৎ করে ও অসুস্থ হল, হঠাৎ করে সব কিছু শেষ হয়ে গেল। বম্বে, হায়দারাবাদ সবই হল কিন্তু খুব অল্প সময়েই সব শেষ, এই-ই। জানিস আমরা একবার তিস্তার বেডে টেন্ট করে ছিলাম, যা কান্ড হয়েছিল, তুই ভাবতেই পারবি না। সে এক অভিজ্ঞতা, মানে সে সাংঘাতিক অবস্থা।

শোন না, গাড়িটা ওখানেই থাকবে? হাতি-টাতি বেরোবে না তো আবার? একটু চা-টা খাবো না কোথাও বসে। সত্যি তুই এক কথায় চলে আসবি আমার সাথে এতদূরে আমি আশাই করিনি। সুন্দরী সাহসিনী বান্ধবী।

তুই সে তিস্তার বেডে রাত কাটানোর গল্পটা শোন্। সেবক পাহাড়ের ওইখানে। আমি বাপ্পা আর ওর এক বন্ধু, মানে আমাদের দুজনেরই বন্ধু আর কি। তো সে-ও দু-একটা টুরে আমাদের সাথে যেত। ওখানে একটা ট্রেকিং রুট আছে জানিস; খুব একটা ভিড়-টিড় থাকে না। সরু একটা রাস্তা দিয়ে তিস্তার বেডে নামতে হয়। নদীটা ওখানে আস্তে করে ডাইনে বাঁক নিয়েছে; অপূর্ব, মনে হবে পৃথিবীর বাইরে একটা অন্য জগৎ। টেন্ট-ফেন্ট নিয়ে আমরা নামলাম। বাপ্পা তো একদম অন্যরকম ছিল, যাইহোক তারপর তো গান শুরু হল। কত যে গান গাইলাম আমরা। পূর্ণিমা ছিল সেদিন; বেছে বেছে দিন ঠিক করত ও। বিরাট একটা চাঁদ উঠল একটু পরে। আমরা আবার কাঠ কুড়িয়ে কুড়িয়ে আনলাম তিনজনেই। ফ্লাস্কে চা ছিল, প্রথমে চা, বিস্কিট, চানাচুর সেই সঙ্গে গান। বালুর ওপর শুয়ে শুয়ে কত কত গল্প... কত স্বপ্ন; আফ্রিকা যাবো মাসাইদের সঙ্গে একমাস থাকবো।

জায়গাটার নাম কী?

ওটার নাম হল, হ্যাঁ পূর্বখোলা। রুটি নিয়ে গিয়েছিলাম আর মাংসটা মসলা দিয়ে মেখেটেখে রেডি করে নিয়ে গিয়েছিলাম, মানে রোস্ট করে খাবো। চাঁদের সে ফাটাফাটি আলো। ভোজ্য-পেয় সবই ছিল। এরপর শুরু তিস্তার বেডে সেবক পাহাড়ের পাশে আমাদের বার-বি-কিউ। আমরা কাঠগুলো জড়ো করে আগুন জ্বালালাম। বেশ মোটা কটা গাছের ডাল ছিল, তিস্তার স্রোতে ভেসে আসে তো বনের কাঠকুটো। বনবস্তির লোকেরা জ্বালানি হিসেবে নিয়েও যায়। আমরা তো এদিকে খাচ্ছি আর মাংস রোস্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছি। আর কিরকম হাওয়া উঠল জানিস! একদম অন্যরকম। তারপর টেনেটুনে তাঁবুটা লাগালাম। অবস্থা তিনজনেরই টলমল; এরপর আর তাঁবু টাঙানোর অবস্থা থাকবে না, বুঝেছিস। সে আগুন জ্বলছে, মাংসগুলো আধপোড়া মতো। আমরা তিস্তার চরের মধ্যে বালুর ওপর শুয়ে শুয়ে গল্প করছি, হাসছি। মনে হচ্ছিল পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটায় কি সুখ, এভাবেই যদি দিনরাতগুলো চলে যায়।

তোর ভয়টয় লাগত না? ওরকম রিমোট জায়গায়। লোকজন মানে গ্রামটাম ছিল না আশেপাশে? আমার বৌ হলে তো অজ্ঞান হয়ে যেত ভয়ে। আর তা ছাড়া আমি মেয়েলোকদের নিয়েই যাবো না ওরকম জায়গায়।

না না ভয়-টয়ের কোনও ব্যাপার নেই। মানে আমরা একদম অন্যরকম ভাবে দেখেছিলাম জীবনটাকে জানিস। আচ্ছা তোকে

একটা কথা জিজ্ঞেস করি অনিন্দ্য, এই যে আমার সাথে জঙ্গলে চলে এলি, বউকে বলবি না? কেমন লাগল? এই হঠাৎ ভ্রমণ?

না না পাগল নাকি?

ও আচ্ছা, তারপর শোন্ সেই পূর্বখোলার ঘটনা। একটু আধটু কী যে খেলাম না খেলাম টেন্টের ভেতর প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে শুয়েছি; বাইরে পড়ে আছে আমাদের সব ব্যাগ-ট্যাগ, ক্যামেরা, টাকা-পয়সা। ঘুমিয়েও পড়েছি কখন, হঠাৎ কেমন সব শব্দ আমার ঘুমটাও গেছে ভেঙে, মনে হল কারা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁবুর চারপাশে। মাঝে মাঝে আলোর ঝলকানি, ভাবছি টর্চের আলো নাকি? বদমাশ লোকেরা লুঠতরাজ করতে এসেছে নাকি? আমার ঘুমটুম উধাও, বাপ্পা তখনও কিচ্ছু টের পায়নি, অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওর বন্ধু তো বাইরেই আগুনের ধারে, বালুর ওপর, ভিতরে আসার আর অবস্থা ছিল না। খুব ভয় পেয়েছি আমি, খুব জোর নড়ছে তাঁবুটা। আমি বাপ্পাকে ঠেলে ঠেলে জাগাতে পারি না, তারপর জোর এক ধাক্কা দিয়েছি বুঝলি; কী হয়েছে কী হয়েছে করে তখন উঠে বসেছে। আস্তে করে দুজনে তাঁবুর বাইরে মাথা বের করে দেখি; কী বলত? বাতাস, বাতাসের কীর্তি! এমন জোর হাওয়া দিচ্ছে, তাঁবুটা নড়ছে ওইভাবে। আর নিভু নিভু কাঠের আগুন হাওয়া লেগে দপ্ করে জ্বলে উঠ্ছে। এই হল কান্ড; আর বন, পাহাড়, তিস্তার জল, তিস্তার চর সব চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। কী যে সুন্দর বলে বোঝানো যাবে না রে।

ভালই অ্যাডভেঞ্চার করেছিস তোরা তাই না? খুব সাহসী মেয়ে তুই, সুন্দরীও। এখনও আরামসে বিয়েটিয়ে করতে পারিস। লিভ ইন করতে পারিস পছন্দের কারও সঙ্গে। তোর চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েনি কিন্তু।

বুঝলাম, তোকে যে গল্পটা বললাম, সে ব্যাপারে একটা কথাও বললি না তো। আমার চেহারা নিয়ে শুরু করলি! ছেলেদের সাথে প্রচুর মেলামেশা আমার। ঘুরে ফিরে এই একরকম কথাই বলে সব। বিয়ে-টিয়ে, দেখি, তেমন ইচ্ছে তো করে না। চল ফেরা যাক। আমাকে নামিয়ে দিয়ে আবার 'এনজেপি' যাবি। চল, সত্যি আমি এতক্ষণে ভাবছি তুই গাড়ি-টাড়ি ভাড়া করে এককথায় এদ্দুর চলে এলি? বাঙালি ছেলেরা তো, মানে তোর বয়সী বাঙালি ভদ্রলোকেরা তো এরকম করবে না। মানে ঝুঁকিপূর্ণ কোনও কাজ তো করে না। সেখানে কতকালের পুরনো বুড়ো বান্ধবীকে নিয়ে গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে এদ্দুর এলি কেন রে? সত্যি কথাটা বল তো।

এরকম বলিস না, বুড়ো বান্ধবী আবার কী? তুই বুড়ো নোস আদৌ। আসলে তোর বর মারা যাবার পর তোর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি। তোকে একবার দেখার ইচ্ছাও ছিল; ট্রাই করলাম, পেয়েও গেলাম এই আর কী। তুই একা থাকিস না কি?

না, মা বাবু থাকেন আমার সঙ্গে। আর আমার এক অবিবাহিতা ননদ থাকে, সে অসুস্থ। এইসব নিয়েই আমার চলছে।

বাব্বা তুই তো বিরাট সংসার পেতে বসেছিস। ভাবলাম মেয়েকে দেখতে এলে তোর ওখানে গিয়ে বেশ আড্ডা-টাড্ডা মারবো।

সে আসতে পারিস, আমি কতটা সময় তোকে দিতে পারবো তা বলতে পারছি না।

প্লিজ এরকম করে বলিস না। শোন তোর হাতটা ধরব একটু। দিবি... না থাক, ড্রাইভার আবার তাকিয়ে আছে। তোর বডিগার্ড নাকি?

হা হা হা, চল। ড্রাইভার দাদা গিয়ে তোর বউকে বলবে, মেয়েকে বলবে তখন দেখিস কী কেলোর কীর্তি হয়। তুই একটা জিনিস সত্যি, বেশ বাচ্চা বাচ্চা ভাব আছে এই বয়সেও।

কেন আমার সাহস নেই নাকি? দেখতে চাস, চল কোথায় যাবি। থাকতে চাস বাইরে গিয়ে? সব হয়ে যাবে। কী রে কথা বলছিস না যে! চলে যাচ্ছিস কেন? দাঁড়া না, আরে...

আয়, অজয়দা স্টার্ট দিন গাড়ি ঘুরিয়ে। আমাকে ছেড়ে আবার তোকে নিয়ে অতটা যাবে। আমি হাফ্ ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি হুঁ।

না না তোকে দিতে হবে না। আমি তো প্ল্যান করেই রেখেছিলাম। তবে আশা করিনি যে তুই রাজি হয়ে যাবি আমার সাথে যেতে।

ঠিক আছে, চল না। এদিকটায় প্রচুর রিসর্ট হয়েছে, বহু লোকজন আসছে ফুর্তি-ফার্তা করছে। তবে বনটাকে তেমন ভালবাসে কী না কে জানে। বাপ্পা কিন্তু সত্যি খুব ভালবাসত নদী, জঙ্গল, গাছপালা, পাহাড়, ঝরনা সব। আমরা ঝরনায় কত স্নান করেছি জানিস। খুব মজা করেছি রে। আচ্ছা তোকে একটা ভাল জায়গায় চা খাওয়াবো। ও থাকতে, এধারে এলে বহুবার আমরা ওখানেই চা খেতাম। অজয়দা, রাণা দাজুর দোকানে চলুন।

বেশ পরের বার আসবি তো আমার সাথে? সামনের মাসে আবার আসবো। মেয়ের সাথে দেখা-টেখা করে তারপর তোর সাথে আউটিং...

২

চা, খাবার সব ঠিক ছিল তো? কেমন লাগল মোমোটা, স্পেশাল। ভাবির হাতের মোমো, দারুন টেস্টি। ঠিক আছে, এবার তা হলে বেরিয়ে যা। অনেকটা রাস্তা। আর রাস্তার যা হাল হয়েছে না। যা খেয়েছিস সব বেরিয়ে যেতে পারে। থ্যাঙ্ক ইউ ফর এভরিথিং। ভালো থাকিস। আর এই টাকাটা ধর। এক হাজার আছে, গাড়ির জন্য দিলাম। না হলে পরে তোর আফশোষ হতে পারে, যে বৃথা টাকা আর সময় নষ্ট হল। একা মহিলা দেখলে তোদের সমস্যা হয় খুব না রে। পুরনো দিনের বান্ধবীকেও একই সারিতে দাঁড় করালি? কী শুনেছিস আমার সম্বন্ধে? এসকর্ট সার্ভিসে নাম লিখিয়েছি?

না, না, টাকাটা রাখ। বিশ্বাস কর সে রকম কিছু ভাবিনি আমি। মানে ভাবলাম, তুই একা...

আসলে কী জানিস বাপ্পার জায়গায় আর কারও কথা ভাবাই যায় না। দু বছর তো হল ও চলে গেছে; আর আমার সবরকম স্বাধীনতাও আছে। আমার কোনও সংস্কারও নেই, কিন্তু কী বলত... যাক তোদের এসব বলে কোনও লাভ নেই। সম্পর্কের জায়গায় আমরা খুব সৎ ছিলাম। এই যে তোর মেয়েকে বউকে না জানিয়ে চুপিচুপি... এসব আমার একদম না পসন্দ। বন-পাহাড় খুব ভালবাসি আমিও, তাই ঘুরে ঘুরে আসি। শান্তি পাই; কার সাথে এলাম এটা একটা আলোচ্য বিষয় পরিচিত মহলে। আসলে আমি নিজেই এখন বেশ মুখরোচক সাবজেক্ট, আমার তাতে কিচ্ছু আসে যায় না। যদি কখনও কাউকে সে ভাবে ভালো লাগে জানতেই পারবি। আর যে সব শুনেছিস আমার সম্বন্ধে, বেশিটাই ওই তোর শেয়াল আর আঙুর ফলের গল্প।

তুই আমাকে ঠিক বুঝতে পারিস নি। আমি মানে কী বলতে... মানে তোকে ঠিক বোঝাতে পারছি না —

বাদ দে। বহুদিন বাদে দেখা হল, এটাই বা কম কী? বাপ্পা চলে যাওয়ার পর এই রকম ব্যবহার অনেক পেয়েছি। অভ্যস্ত হয়ে গেছি রে। অজয়দা আপনি স্টার্ট দিন, দেরি হয়ে যাবে আপনাদের। টা টা অনিন্দ্য ভাল থাকিস। আর একটা কথা তোর নম্বর তো রইলই। দরকার হলে আমি ফোন করে নেবো কেমন।

মানে ফোন করতেও মানা করছিস?

না, তা নয়... ওকে ভাল থাকিস, টা টা।

স্কেচ : সুদত্তা বসু রায়চৌধুরী

Accommodation
Swimming Pool
Health Club & Gym
Spa & Massage
Indoor Games

Siliguri Club

Eastern Bypass Road,
Near Iskcon Road Crossing, Siliguri - 734001
Phone :- 0353 2592288 (O),
E-Mail - info@siliguriclub.com

EKHON DUARS, Vol-1, Issue-3, DL No.-65, dtd. 24.03.2014, Rs. 12 Only

• Buxa Tiger Reserve • Chilapata Reserve • Coochbehar Palace • Gateway to Bhutan

The Heritage Duars Welcomes You

How do you reach

Nearest Railway Station : Dalgaon-Birpara and Hasimara on Kanchankanya Express Route. Falakata and New Coochbehar on general NJP-Assam route (Uttarbanga/Teesta-Torsha/Garib Rath/Kanchanjungha/Saraighat Express).

By Road : Accessible from Siliguri/Bagdogra/NJP and Coochbehar/Alipurduar

Best of Accommodations

Madarihat Tourist Lodge

A WBTDC owned resort with AC rooms and cottages, restaurant and bar, playing ground for the kids.

Acacia Resort

An eco resort in the midst of sprawling tea gardens and wilderness of Khayerbari with marvelous stay and dining.

Jaldapara Tourist Nest

A cosy nature resort in a homely atmosphere, facilities of food-stay and indoor games-library, on the way to Totopara.

Duars Eco Wonders. Kolkata booking 18/7 Dover Lane, Kolkata 700 029 Phone 9903832123, 9830410808, 033-65360463

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.